আল-কায়েম আল-মুন্তাযার

আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন: মানুষ যখন হেদায়েতকে আত্মাভিলাষের অনুগত বানাতে থাকবে সেই সময় তিনি (ইমাম মাহদী আঃ) আত্মাভিলাষকে হেদায়েতের অনুগত বানিয়ে দেবেন... অতঃপর তিনি তোমাদের দেখিয়ে দেবেন যে, ন্যায়পরায়ণ সীরাত কাকে বলে এবং কোরআন ও সুন্নতকে কিভাবে নতুন জীবন দিতে হয়।

(নাহজুল বালাগাহ্, খুৎবাহ্ নং ১৩৮)

আল-ক্বায়েম

আল-মুন্তাযার

(বাংলা সংস্করণ)

ইমামে জামানা বিষয়ক সাময়িকী

শা’বান সংখ্যা

শعبان ۱۴۴۴ هجری ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিষয় সূচী

১. হামলা

২. ইমামে জামানা (আঃ)-এর প্রতি এক আধ্যাত্মিক অনুরাগ

৩. হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর 'আনসার' (সাহায্যকারী) রমণীদের ভূমিকা

৪. আল্লাহর ন্যায় বিচারের অপেক্ষায়

৫. 'মাহদী ইজম'-এর উপর রাবেতায়ে আলাম-এ-ইসলামীর গবেষণামূলক প্রতিবেদন

৬. ক্বোরআনে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বর্ণনা

৭. হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নাম ও উপাধি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
و صلى الله عليک يا ولى العصر (عج) ادركنا

হামলা

এটি এমন একটি শব্দ যা সাধারণতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শোনা যায়, আর যেটি শুনলে মনে হবে যে, যুদ্ধের ময়দান লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। উভয় দিকের সৈন্যরা ঢোল পিটিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং মাঠ থেকে প্রথমে যে আওয়াজটি ওঠে সেটা হল 'হামলা'।

যদি আম্বিয়া ও আউসিয়া যাঁদের পরম্পরা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে, তার ইতিহাসকে যদি প্রজ্ঞা, ন্যায় ও ইন্সাফের আলোকে পর্যালোচনা ও চিন্তা করা হয়, তাহলে পর্যবেক্ষণের শৃঙ্খলও তারই প্রতিফলন ঘটায় যে, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে, দুটি পক্ষ কেবল একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই বরং তারা প্রচণ্ডভাবে একে অপরের উপরে আক্রমণ হানছে, আর তাদের উভয়েরই কাছে যুদ্ধের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে যা দিয়ে তারা আক্রমণ করে চলেছে। ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম (আঃ)-এর মূর্তি রাখা ছিল, আর আদেশ হলো যেইমাত্র উক্ত মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত করা হবে তৎক্ষাণৎ সকলে তার সামনে সেজদাহবনত হবো। অতএব রূহ দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সেজদাহবনত হলো, "-إِلَّا ابليس ইল্লা ইবলিস" (ইবলিস ব্যতীত।) তাকে সেজদাহ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে নিজ স্রষ্টার সামনে এসে বুক ঠুকে উত্তর দিল, "আমি তার চেয়ে উত্তম, আমার সৃষ্টি আগুন হতে, আর আদমের এই সৃষ্টি মাটি হতে।" সুতরাং যখন তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তখন সে বলেছিল, "আমি তার প্রজন্মকে বিচারের দিন পর্যন্ত বিপথে নিয়ে যাবো (অর্থাৎ সে যেন বলতে চাচ্ছিল যে, আমি পৃথিবীকে তাদের রক্তে রঞ্জিত করে দেবো)।

ইবলিস (শয়তান)-এর প্রথম পদক্ষেপ

এ প্রসঙ্গে কবি ইকবাল তাঁর কবিতার ভাষায় এভাবে রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন যে, আল্লাহ বলেন:

জাহান র জে ইয়াক আব ও গুল আফ্রীদাম,
তু ইরান ও তাতার ও যাঙ্গ আফ্রীদী
আমি পৃথিবী সৃষ্টি করেছি একই মাটি ও পানি থেকে,
তুমি তাতে ইরান ও তাতারী ও আফ্রীকা বানালে।
মান আয খাল পুলাদে নাব আফ্রীদাম
তু শামশীর ওয়া তীর ও তুফাঙ্গ আফ্রীদী
আমি মাটি থেকে খাঁটি ইস্পাত সৃষ্টি করেছি,
তুমি তীর ও তরবারি ও বন্দুক বানালে।
তাবার আফ্রিদী নিহাল চামান রা
ক্বাফাস সাখতি ত্বায়েরে নাগমেহ্ যান রা
কুঠার বানালে বাগিচা কাটার তরে,
খাঁচা বানালে গাইতে থাকা পাখির তরে।

আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা উক্ত শয়তানী আক্রমণের ধারণার আভাস বা সংক্ষিপ্তসার ইতিহাস যা আমাদের বলে দিচ্ছে। যেমন সত্য ও হক্ব এই পৃথিবীতে প্রকট, তেমনি একটি বিশাল বাহিনীও এটিকে আক্রমণ করতে থেকেছে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইবলিসের সাথে উক্ত কথোপকথনেই বলে দিয়েছিলেন যে, তুই আমার নেক বান্দাদের কখনও বিভ্রান্ত করতে

পারবি না। এটা তো প্রারম্ভিক সময়ের কথা, কিন্তু ইবলিসের যাত্রা প্রতি পদে ছিল উত্তাল।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইবলিসের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ক্বাবীলের আকারে, যে হাবিলকেও হত্যা করেছিল এবং তার লাশ কাঁধে নিয়ে টহল দিতে থেকেছিল এবং অবশেষে তার লাশ ভূ-গর্ভে দাফন করেছিল।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

নূহ (আঃ) যাঁকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়, তাঁর উপর তাঁর সম্প্রদায় পাথর বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু তাঁর জাতির উপর যখন শয়তানের আগ্রাসন প্রবল আকার ধারণ করেছিল তখন কেবল একটি বন্যা প্রলয় সৃষ্টি করে দিয়েছিল যা নূহের পুত্রকেও ছাড়েনি। শয়তানের যে পৈশাচিক আগ্রাসন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে কব্জা করে রেখেছিল তা ভেঙ্গে গেল এবং নতুন পৃথিবীতে অবশিষ্ট সৃষ্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তৃতীয় পদক্ষেপ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য একটি 'ক্যাটাপল্ট' (চাম-গুলতি) প্রস্তুত করা হয়েছিল। আর ইতিহাসের অধ্যয়নে জানা যায় যে, নমরূদের জ্বালানো আগুনের তীব্রতা কত ছিল, আর তা চিন্তা করলে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা এবং নবুয়্যত প্রচারের দায়িত্ব যথাযত পালনের দরুন এই নমরুদী আক্রমণে আগুনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং একটি হৃদয় বিদারক আগুন ও তার শিখা সুগন্ধযুক্ত বাগিচায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

চতুর্থ পদক্ষেপ

ইবলীসের আগ্রাসন ও তার ধারা বন্ধ হওয়ার কি জো ছিল? হযরত হাজেরা যখন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর গলায় রশির চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন তিনি এতটাই মর্মাহত ও দুঃখিত হলেন যে, তিনি সে শোক বরদাস্ত করতে পারলেন না, তাঁর প্রাণহানির কারণ হলো।

পঞ্চম পদক্ষেপ

পৃথিবীতে শয়তানের আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছিল। ফেরাউনের সেনাবাহিনী এমন এক বিপর্যয়ের মতো হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতার সমস্ত বার্তা মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু মহান রব্বুল আলামীন এমন এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা যে, সবকিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব। (মহাবিশ্বের মাওলা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) যে কর্তৃত্বকে দোয়ায়ে কোমায়েলের মধ্যে এভাবে ব্যক্ত করেছেন: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ.... হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করি... তোমার সেই শক্তিমত্তা ও পরাক্রমের ওসীলায় যা সবকিছুকে পরাভুত করে রেখেছে।) যাইহোক মহান রব্বুল আলামীন নীল নদে বারোটি চ্যানেল (পথ) তৈরি করেছিলেন, আর যখন ফেরাউনের বাহিনী সেখানে প্রবেশ করে তখন (মহান রব্বুল আলামীনের সেই পরাক্রমে) সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং পুরো বাহিনী ডুবে যায়।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ

হযরত মরিয়াম (আঃ)-এর উপর যখন আক্রমণ করা হয় এবং ইবলিসের উপাসকরা বাধ্য হয়ে হযরত মারিয়াম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন এটি কার সন্তান, তখন তিনি ইঙ্গিত করে বললেন: আমি রোজা অবস্থায় আছি। তোমরা বাচ্চাটিকে জিজ্ঞাসা করো। দোলনা থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর উচ্চ হলো: اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা, (তিনি) আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।[1]

ইবলিসের সাঙ্গো-পাঙ্গোরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং প্রকম্পিত অবস্থায় নিজেদের আঙুল কামড়াতে লাগলো।

সপ্তম পদক্ষেপ

---

[1] *সূরা: মরিয়াম, আঃ ৩০।*

যে কূপ এতো গভীর ছিল যে, তার পানি দেখা যাচ্ছিল না, সেই অন্ধ কূপে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা কি তাঁকে (আঃ)-কে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল? অথচ সেই ইউসুফ আলাইহিস সালামই তো দুর্ভিক্ষে তাঁর ভাইদের সাহায্যকারী হয়েছিলেন। পুরো ঘটনাটি সৎপন্থিদের জানা রয়েছে।

দুর্গ

প্রবন্ধকার নবীদের কাহিনী হতে কিছু শয়তানী আক্রমণাক্ত উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন, কেননা প্রতিটি যুগে শয়তানের আক্রমণ বাড়তে থেকেছে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে এর উত্থান-পতনের উপরেও দৃষ্টি রয়েছে, কেননা হকপন্থীদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, কতদিন এই ঝড়ো-আক্রমণ ও আক্রমণের ধারা বিশ্বে দিন-প্রতিদিন শক্তি অর্জন করতে থাকবে? আর হকপন্থীদের জন্য কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ উপায় এবং অস্ত্রও সরবরাহ করেছেন? নাকি তাদের শুধু অত্যাচারী ও অত্যাচারের যাঁতাকলে পেশাই হতে হবে? একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিক্রম করার পূর্বে অষ্টম ইমাম রেযা (আঃ)-কে এই ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন তা জেনে নেওয়া যাক: ইমাম (আঃ) বললেন: لا اله الّا الله-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি দুর্গ। যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে তবে সেখানে প্রবেশের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে এবং সেই সকল শর্তের অন্যতম হলাম আমি। অর্থাৎ একটি শর্ত হলো ইমামত। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, তবে বিশ্বাসের আলোকে বলা যায় যে, ইমামতের জ্ঞান চিরন্তন জ্ঞান। এই বাক্যটিতে ইমাম (আঃ)-এর জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় যে, শয়তানের আক্রমণের ঝড় যতই শক্তিশালী হোক না কেন, দুষ্টরা এই দুর্গের কাছে আসতে পারবে না।

আর উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি নবুয়্যতের ধারা অবধি পরিব্যাপ্ত যে, যখন পাপাচারীরা সীমা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছে তখন মহান রব্বুল আলামীন তাদের শুধু তাড়িয়ে দেননি, বরং নিষ্পেষিত করে দিয়েছেন।

অবকাশ

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দেওয়া অবকাশের সুযোগ নিয়ে (ইবলিস) এই আক্রমণ ও ঝড় কি এতো সহজে থামাবে? তবে মনে রাখতে হবে অবকাশ কিন্তু একটি সময়ের উপর নির্ভর করে এবং সীমায়িত জিনিস। সময়-কাল অর্থাৎ ইবলিসের আক্রমণ ও ঝড় পুরো গণহত্যার সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে থাকবে তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর শেষ দেখতে পাওয়া যাবে। যদিও এই সময়ে হানাদার ইবলিসের যাত্রা ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আগেই তার থেকে নিরাপদ থাকার কথা বলে রেখেছিলেন যে, সে কখনো আমার নেক বান্দাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। আর তার জন্য তিনি প্রকাশ্যে ও প্রচ্ছন্নে পূর্ণ নির্দেশনা প্রকাশ করেছিলেন। ঐশী বাণী হলো: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান (ভারসাম্য-মানদন্ড) নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

মো'মিনদের উপর দুষ্টের শক্তি যতই অত্যাচারপূর্ণ হোক না কেন, এই দুর্গে তারা তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং এই দৈনন্দিন জীবনের বিপদ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের কাছে আখেরাতের দীর্ঘ জীবনের অর্থ প্রকাশ পাবে।

শেষ নবী যখন হেদায়েতের কার্যাদি সম্পাদনা করে দিয়েছেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানদান সমাপ্ত করে দিয়েছেন, তখন তিনি বলেছেন: এবার আমার পরে আমার বারোজন খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) আসবেন যাঁরা হবেন মো'মিন, দুর্বল, অভাবগ্রস্ত, সৎকর্মশীল, অন্যের উপকারকারীদের ও দানশীলদের সুরক্ষা কবচ ও আশ্রয়স্থল এবং তাঁরাই এদেরকে রক্ষা করবেন।

ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় ঝড় এসেছে, নতুন স্টাইল, নতুন রং, নতুন পরিকল্পনা, রাজনীতির নতুন ধরণ, যা সত্য ইসলামকে মিথ্যা হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা আড়াল করার চেষ্টার কোন কসরত রাখা হয়নি, কিন্তু ঐ সকল প্রতিকুল পরিস্থিতিতে মহানবী (সঃ)-এর এই বাণী পাথরের রেখা রূপে উদ্ভাসিত হতে থেকেছে। এমনকি ইয়াজিদ তার সভাসদে ভরা দরবারে ঘোষণা করেছিল যে, কোন রসূল আসেনি বা কোন ওহী আসেনি। কিন্তু হযরত জয়নাব সঃ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।)-এর প্রদত্ব খোৎবাহ্ উক্ত ভরা দরবারে তাঁর প্রামাণ্য দলিল হয়ে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, আর শ্রোতারা বলতে থাকে যে, এই বাগ্মিতা ও এই কন্ঠ, এই ভাষালঙ্কার!!! যেন, আলী (আঃ) কথা বলছেন। এই খুৎবাহটি ইয়াজিদের অবৈধতার উপর এমন এক চপেটাঘাত ছিল যে, শুধু ইয়াজিদই নয়, তার সমস্ত পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীরাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষেপে গিয়েছিল। সিরিয়ার ইয়াজিদী দরবার আগ্রাসনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ছিল, কিন্তু তা ইমামতের পদতলে পিষ্ট হয়েছিল। তাই বলতে হয় যে, ইমামত হলো সেই পরিশুদ্ধ আত্মা যাঁরা হলেন ঐশ্বরিক দুর্গে প্রবেশের অনুমতির শর্ত।

ইমাম হোসাইন (আঃ) আশুরার রাতে এক রাতের অবকাশ দিয়েছিলেন, যার একটি উদ্দেশ্য ছিল: আলেমরা বলেছেন যে, ইয়াজীদের সেনাবাহিনীতে যদি কোনো ধার্মিক ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকে, সেও যেন ইমাম (আঃ)-এর শিবিরে চলে আসেন। তাই জনাব হুর (আঃ) ছাড়াও আরো কিছু সত্ত্বার কথা বলা হয়েছে যে, তাঁরা শেষ মুহূর্তে চলে এসেছিলেন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সামনে এবং 'Grace Period-অবকাশকালীন সময়'-এর সমাপ্তির সব দৃশ্য সামনে আসছে। ধ্বংস, অপচয়, রক্তপাত, দারিদ্র্য, অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, নগ্নতা, বিলাসিতা, বর্বরতা, এক জাতি আরেক জাতির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত, সবকিছুই তার ক্লাইম্যাক্সের দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীতে, খাতিমুল মুর্সালীনের শেখানো জীবনযাত্রা এখনও জীবিত ও প্রজ্জ্বলিত। যেন চারিদিক থেকে মানবতা ও মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরকালের প্রতিশ্রুতি ভেসে আসছে যে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! কিতাবের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ও ন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ততা তোমাদেরকে নিরাপদ রাখবে এবং তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দুর্গে সংরক্ষিত থাকবে। কিতাব বলছে: بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- "আল্লাহর অবশিষ্ট তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মো'মিন হও।"

পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, নিরঙ্কুশের দিকে একটি অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যেখানে ধার্মিকদের আক্রমণ করা হয়েছে। সমুদ্র, বাতাস, পৃথিবী, চারদিক থেকে অনেক বিপজ্জনক অস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। তবে আল্লাহর শেষ হুজ্জাত, শেষ ইমাম যাঁকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের পরকাল রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিত রেখেছেন, তিনি আমাদের হতে গাফেল বা উদাসীন নন। প্রত্যেক নামাযে প্রত্যেক রাকাতে সূরা আলহামদের পুনরাবৃত্তি করা হয়, কিন্তু কে বা কারা এই انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم এবং ولاالضالين-আনআমতা আলাইহিম, গইরিল মাগ্বযূবি আলাইহিম, ওয়ালায যাল্লীন? তা বিবেচনা করে দেখার অবকাশ নেই কারোর, সবাই ইমাম মাহদী (আঃ)-কে বিশ্বাস করে কিন্তু স্বীকার ও অস্বীকার একসাথে চলে।

আল্লামা ইকবালের মতে: স্রষ্টার কাছে সেজদাহ, এবং ইবলীসের সাথে বন্ধুত্ব, ভক্তির প্রতিদান শেষ পর্যন্ত কার কাছে চাইবে?

আমাদের সকলেরই আমাদের ইমামগণের প্রতি এই বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রত্যেক যুগে তাঁরা আমাদের ঈমানের আয়নাকে ধুলো-বালিতে মলীন হতে দেন না। এঁরা হলেন আমাদের আলেম এবং সেইসব খোদাভীরু ধার্মিক বিশুদ্ধ আত্মা যারা প্রত্যেক যুগে হযরত মাহদী (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের গৌরব অর্জন করেছেন। কাদের কাছে তিনি আসেন বা কারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন তার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে।

সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি কীভাবে সেজদাহ করবো? দোয়ায়ে মাশলূলে সে বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে: يا شَفيقُ يا رَفيقُ فُكَّنى مِنْ حَلَقِ الْمَضيقِ. ওহে শফীক্ব! ওহে বন্ধু! আমাকে সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে মুক্ত করো। আমাদের পালনকর্তা, আমাদের প্রভু, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে একটি আশ্রয়স্থল স্থাপন করেছেন, যা আমাদের রসূল (সঃ)-এর এই হাদীস দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যখন পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাবে তখন আমার শেষ উত্তরাধিকারী আবির্ভূত হয়ে এই পৃথিবীকে ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেভাবে এটি অন্যায়ে ভরা থাকবে। তিনি হলেন মাহদী আখেরী জামান (আঃ)। তিনি একজন উপস্থিত ইমাম এবং তাঁর জন্য, গায়বতের পর্দাও রয়েছে। যখন তাঁর আবির্ভাব হবে, তখন পবিত্র চেহারা থেকে গায়বতের পর্দা সরে যাবে, নতুন সূর্য উদিত হবে, আলো জ্বলবে, রহমতের বৃষ্টি হবে, বিরোধীদের বিপথগামীতা তাদেরকে আল্লাহর অভিশাপের অধিকারী করে তুলবে। আর তারা আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে। 'দোয়ায়ে আহদ'-এ রয়েছে: اللّهُمَّ أَرِنِى الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ হে আল্লাহ! আমাকে প্রকট উদয়মান প্রত্যক্ষ করাও।

দেখুন! শয়তানী আগ্রাসন নূহের প্লাবনে ডুবে যাবে, নমরূদের আগুন জ্বলবে না, কিন্তু ইয়াজীদী কর্মপন্থা, পৃথিবীর পাথরগুলোও বাতাসের বিষাক্ত ঝোড়ো হাওয়ায় এমনভাবে আবদ্ধ হবে যে, জাহান্নাম সাজা দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলবে: এগুলো আমার খাদ্য।

পাঠকবর্গ! প্রবন্ধকারের এক নিরবিচ্ছিন্ন দাবি যে, এই যুগে প্রতিটি মো'মিনের জীবনযাপনের জন্য একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ নমরূদের আগুন সমস্ত ষড়যন্ত্রকে কাঁধে নিয়ে আগ্রাসী হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। যত্র-তত্র পারমাণবিক স্থাপনায় পৃথিবী কাঁপছে, রাজনীতির নখর দিয়ে গরীব, দরিদ্র, অজ্ঞ ও দুর্বলদের রক্ত চুষে তাদের দুর্দশার দিকে ঠেলে দেওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মানবতার মৃত্যুর বেশি দেরি নেই। কিন্তু আল্লাহ তো সেই সত্ত্বা যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি সর্বশক্তিমান, আর যিনি হলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তিনি পৃথিবীতে এমন একটি দুর্গ স্থাপন করেছেন যার ভিত্তি মজবুত, যার দরজার চাবি ক্বায়েমে আলে মোহাম্মাদ (ইমাম মাহদী আঃ)-এর হাতে। যারা সচেতনভাবে এবং তাদের মাওলা ও আক্বা ওয়ালী আল-আসর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইঙ্গিতে ঐ নির্দেশনাবলীর বয়ান পাঠ করবে যা আমাদের গুণাবলীসম্পন্ন আলেমগণ এবং সত্যপ্রেমী ব্যক্তিরা আমাদেরকে অবহিত করে চলেছেন এবং আমাদের জাতি যতদিন উক্ত চিহ্নিত পথ অনুসরণ করতে থাকবে প্রতিটি দিক থেকে, প্রতিটি কোণ থেকে, আমাদের জাতি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব অবধি নিরাপদ থাকবে। তিনি (ইমাম মাহদী আঃ) হলেন দ্বার উন্মুক্তকারী ও অভিভাবক, তিনি হলেন বিভ্রান্তদের অর্থবহ আশ্রয়স্থল, তাই প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি শিয়াকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্রের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে উজ্জ্বল ও উত্তম পরকালের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

২২ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

গায়বত এমন একটি পরীক্ষা রেওয়ায়েত অনুসারে যে পিরিয়ডে একটি বিশাল সংখ্যক লোক পথভ্রষ্ট হবে, কেবলমাত্র কিছু লোক ছাড়া যারা সত্যিকার অর্থে অপেক্ষা কাকে বলে তা বোঝে। আর এই বুঝ-শক্তি সেই এক্বীন ও বিশ্বাসের দ্বারা সৃষ্টি হবে যা আল্লাহর ওয়াদার অবশ্যম্ভাবি হওয়া বিশ্বাস করে, আর তার সুফল এই হবে যে, আল্লাহর হুজ্জাত গায়েব থাকা সত্বেও এই মানুষেরা আঁধারেও আলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

তাই প্রকৃত অপেক্ষাকারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা ভিন্ন। এটা সম্মানের বিষয় যে, তার ঈমান আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে রয়েছে। কেননা তার অপেক্ষা দৃশ্যত প্রতীক্ষা,

কিন্তু বাস্তবে তার অপেক্ষার পিছনে রয়েছে গভীর অপেক্ষাকারীর মধ্যে বিশ্বব্যবস্থার প্রস্তুতি। এই অপেক্ষাই তাকওয়া ও পরহেজগারীর শিক্ষা দেয়, الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (নবীপাকের) নিকটাত্মীয়ের ভালোবাসার পাঠ দেয়, এই অপেক্ষাই ক্বোরআন ও আহলে বাইত (আঃ) কে আঁকড়ে ধরায়, এই অপেক্ষাই আমাদের নিয়ে যায় সেই ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব-ব্যবস্থার দিকে যার কারণে মানুষ দুঃসময়েও আশার আলো অনুভব করে।

আমরা এই নিবন্ধটি এই কথা দ্বারা শেষ করতে চাই যে, যদিও অপেক্ষা এক বিশাল সমুদ্র, তাই প্রতীক্ষাকারী যখন এতে ডুব দেয় তখন তার ঈমানের স্তর কী তা বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ কারণে হুজুর পাক (সঃ) এবং তাঁর বংশধারার অন্যান্য ইমামগণ (আঃ) বার বার এই হাদীসটি জোর দিয়ে বলেছেন: উম্মতের শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো ইমামের অপেক্ষা করা।

গায়বতের যুগে অপেক্ষা করা শুধু অপেক্ষা নয়, বরং প্রকৃত অর্থে ইমামে জামানা (আঃ)-এর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ন্যায় ও ইন্সাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার ও খোদায়ী ওয়াদা প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দেওয়া। আর তাই এর ভিন্নতা ও অস্বীকার করা ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি ও ঐশ্বরিক শাসন ব্যবস্থা অস্বীকার করার শামিল।

কবি মির্জা দবীর তাঁর কাব্যে গায়বতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন:

আমলের প্রতিদান একদিন পূর্ণ হবে,
অপ-মৃত্যু মরেছে, মরবে একদিন।
যাদের গায়বতের বিষয়ে রয়েছে সন্দেহ
তারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে একদিন।

হ্যাঁ, প্রিয়গণ! মোহাম্মাদ (সঃ)-এর পরিবারের ক্বায়েম (ইমাম মাহদী আঃ) এখনও রয়েছেন, অপেক্ষা তাঁর সর্বজনীনতা এবং তাঁর পদোন্নতি সাধন করছে, আর যারা অপেক্ষা করছে এবং যারা তাঁর অনুসরণ করছে তাদেরকে হেদায়েতের এমন এক আলো দেওয়া হয়েছে যে, তারা সমস্ত সমস্যা সহ্য করে এমন স্থানে পৌঁছাবে যেখানে একটি বিশ্বব্যাপী ন্যায়পর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ- মুশরিকরা তা ঘৃণা করলেও।

ইমামে জামানা (আঃ)-এর প্রতি এক আধ্যাত্মিক অনুরাগ

মরহুম শেখ সদূক্ব (আল্লাহ তাঁর উপর রাজি ও সন্তুষ্ট থাকুন) তাঁর মূল্যবান বই ‘কামালুদ্দ্বীন ওয়া তামামুন্নেমাহ্’-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৩তম বাবে ইমামে জামানা (আঃ)-এর সাথে ইব্রাহীম বিন মাহযিয়ারের সাক্ষাৎ তাঁরই জবানী বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহীম বিন মাহযিয়ারের উপাধি ছিল আবু ইসহাক, তাই ইমামে জামানা (আঃ) তাঁকে আবু ইসহাক বলে সম্বোধন করেছেন। এই বৈঠকে আবু ইসহাক এবং ইমামে জামানা (আঃ)-এর মধ্যে কথোপকথন হয় এবং উভয়কে জায়গায় জায়গায় কথা বলতে দেখা যায়। এই নিবন্ধে, আমাদের উদ্দেশ্য তাদের বৈঠকের বিস্তারিত বর্ণনা করা নয়, শুধুমাত্র একটি বিশেষ অংশ পাঠকদের সেবায় পেশ করা। তাঁর দীর্ঘ কথোপকথন অব্যাহত রেখে, হযরত (আঃ) বলেন: اِعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ نَزَعَ إِلَيْكَ مِثْلَ الطَّيْرِ إِلَى أَوْكَارِهَا হে আবু ইসহাক! আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, হে বৎস! জেনে রাখো, নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যশীল মানুষ ঐ পাখির মতো যারা আগ্রহ ও আশা নিয়ে তাদের নীড়ে ফিরে আসে, তারা তোমার দিকেও অনুরূপ আগ্রহ ও আশা নিয়ে ছুটে আসে।[1]

আন্তরিকতা এবং আনুগত্য

যদি আমরা ইমামে জামানা (আঃ)-এর তাগিদ বিবেচনা করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গায়বতকালীন সময় শিয়াদের এবং ইমামে জামানা (আঃ)-এর অনুসারীদের আন্তরিকতার সঙ্গে ইমামের দিকে কিভাবে ঝুঁকতে হবে। ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাঁর পুত্রকে যে কথা বলেছেন ইমাম মাহদী (আঃ) ইব্রাহীম বিন মাহযিয়ারকেও সেই একই কথা বলেছেন যে, পাখি যেমন তার বাসায় ফিরে যায় ঠিক সেরূপ বাধ্য ও অনুগত মানুষ আগ্রহ, আবেগ ও উদ্বেগ নিয়ে তোমার দিকে ধাবিত হবে।

[1] *কামালুদ্দ্বীন, খঃ ২, পৃঃ ৪৪৮।*

সত্যবাদীদের অন্যতম ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য এমনই যে, ব্যাপ্ত করলে তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর গুটিয়ে নিলে মানুষ নতুন জীবনের সংবাদ পায়। এখানে ইমাম (আঃ) ইমামে জামানা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছার কথা বলেছেন যে, আলীর শিয়াদের মধ্যে যুগের ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করার কতো আবেগ, আশা ও উদ্দীপনা থাকা দরকার, আর উক্ত সাক্ষাতের উপকারিতা ও আধ্যাত্মিক স্থান কতো!!! এগুলো সব ইচ্ছা ও আকাঙ্খার শ্রেণী যে, কার কতো ইচ্ছা ও আকাঙ্খা রয়েছে। আমাদের ইমাম হলেন একজন মেহেরবান পিতার ন্যায়, তিনি আমাদের রক্ষা করেন, তিনি আমাদের দেখাশোনা করেন, তিনি আমাদেরকে তাঁর করুণার ছায়ায় স্থান দেন। যদিও তিনি আমাদের চর্ম-চক্ষুর অন্তরালে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা। ইচ্ছা ও আকাঙ্খা মানুষের আন্তরিক দিককে আলোকিত করে। হায়!!! যদি আমাদের আবেগ ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা ইসমাঈল হারক্বুলীর মতো হতো!!! তাহলে তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা আমাদের ইমাম (আঃ)-এর যিয়ারত (তীর্থযাত্রা) মিস করতাম না। আমাদের ইমাম (আঃ) যুগের অভিভাবক, খোদার ওলী ও তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের অভিভাবক। আপনি যদি আপনার আবেগ সম্পর্কে উৎসাহী হন তবে আপনি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারেন। আবেগ অনুভূতির উপর ভিত্তি করে। এর অভিন্নতা দ্বারা এটিকে দুর্বল করা উচিত নয়, অন্যথা সাবধান! অধঃপতন ও বঞ্চনা কিন্তু সামনেই।

এই নিবন্ধটি "পাইওয়ান্দ মানাবী বা সাহাতে ক্বুদস মাহদাভি (তাকালিফুল আনাম ফি গাইবাতিল ইমাম) বই থেকে লেখা হয়েছে। এই বইটির লেখক হলেন সদরুল ইসলাম আলী আকবর হামাদানী। তাঁর জীবনকাল ছিল ১২৭০ হিজরী থেকে ১৩২৫ হিজরী অবধি, অর্থাৎ ১৮৫৩ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি

হামাদানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি নাজাফে আশরাফে যান এবং মুহাদ্দিস নূরী ক্বুদস সির্রুহ, আক্বা সৈয়দ মোহাম্মাদ মুজতাহিদ মুসাভি নাজাফী হিন্দী তাবেরাহ, যিনি শেখ মুর্তজা আনসারী রিজওয়ানুল্লাহ তায়ালা আলাইহি-এর অন্যতম শিষ্যদের ছিলেন এবং তিনি মরহুম হাজী মির্জা হোসাইন রাজী তেহরানী প্রমুখ হতে ৬ বছর শিক্ষার্জন করেছেন। পরে তিনি তাঁর মায়ের সাথে ইরানে ফিরে আসেন এবং তেহরানে ও হামাদানে কিছু বছর লেখা-লেখি, লেকচার ও শিক্ষাদানের সাথে যুক্ত থাকার পর আবার নাজাফে ফিরে আসেন। আর দুই বছর পর তিনি আবার হামাদানে ফিরে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা অনেক, আর কিছু পুস্তক তো কয়েক খন্ডে পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তাঁর উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

আমরা যদি এই প্রবন্ধের শিরোনামের দিকে লক্ষ্য দেই, তাহলে বুঝতে পারি যে, আমাদের নিকট এই দাবি করা হচ্ছে যে, গায়বতকালীন সময়ে আমাদের দায়িত্বগুলি কী? আর সেই দায়িত্বগুলি পূরণ করে কিভাবে আমরা আমাদের ইমামকে সন্তুষ্ট করতে পারি? কিভাবে তাঁর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, কিভাবে নিজের অস্তিত্বকে আধ্যাত্মিকতার আলোতে আলোকিত করতে পারি, যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির ও সাফল্যের কারণও বটে।

উক্ত দায়িত্বগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা:

(১) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব

(২) সাধারণ ব্যক্তিদের দায়িত্ব

(৩) হাদীসের বর্ণনাকারী, শাকস, বিচারক ও ফক্বীহগণের দায়িত্ব

১. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব মানে ইমামে জামানা (আঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের দায়িত্ব, যাঁরা তাঁর গোপনীয়তারও সাথী। রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত খিযর (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফীল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত আজ্রাঈল (আঃ) এবং যমীন ও আসমানের প্রধান ফেরেশতাগণ এবং মুসলমান ও মো'মিন জিনদের সর্দার, এবং আবু সালেহ, যিনি জিনদের অন্যতম। মরুভূমি ও বণে-জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের সহায়তাদানকারী, অর্থাৎ এঁরা স্থলভাগের পথপ্রদর্শনের দায়িত্বে রয়েছেন, সেইসাথে হামজা নামের জিন যিনি জলভাগের দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে আব্দুর রহমান, আব্দুল ক্বাদির, ফাক্বতাশ, আবু ফারদাহ্, মাস্তুর, রিয়াহ্, ক্বায়েস এবং আবু মালিকও রয়েছেন। এঁদের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার জিনরা হলেন মুজতাহিদ (যিনি চরম ইবাদতকারী), যেমন আবুল আব্বাস ও আব্দুশ শাহাব প্রমুখ। এঁরা সকলে বড়ো বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আদেশ পালনে রত থাকেন।

একইভাবে তাঁর বিশিষ্ট চারজন 'নায়েব' ডেপুটি বা প্রতিনিধি এবং গায়বত সুগরাতে অন্যান্য নায়েবগণ যাঁরা বিভিন্ন দেশে তাঁর পক্ষ থেকে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের সকলের আত্মাও খাওয়াস বা বিশিষ্টজনের মধ্যে গণ্য। অনুরূপ সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা উচ্চতর মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন যেমন শেখ মুফীদ ও অন্যান্য তিরিশজন ব্যক্তি যাঁরা সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন এবং আরও অন্যান্য অনেক ব্যক্তি যাঁদেরকে অন্য কেউ চিনতো না। এঁদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ধরণের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, যেমন তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি, যে তথ্যগুলো অন্য কারও জানা প্রয়োজন নয়।

(ইমামে জামানা (আঃ)-এর বসবাসের স্থানটি গৌণ গায়বতকালীন সময়ে তাঁর বিশিষ্ট নায়েবগণের জানা ছিল। তবে এই দীর্ঘকালীন

গায়বতে কেবল সেই সৌভাগ্যবান গোলামের জানা যিনি তাঁর খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁর বসবাসের স্থানও জানি না, আর সেই সৌভাগ্যবান গোলমকেও চিনি না!!![1]

২. সাধারণ ব্যক্তিদের দায়িত্ব

এই সাধারণ ব্যক্তিরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যথা: কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা সর্বদা হযরতের দৃষ্টির সামনে রয়েছেন। তবে এটা স্পষ্ট যে, এঁদের দায়িত্ব উক্ত অদৃশ্যগণদের দায়িত্ব হতে পৃথক। এই সম্মানীয় ব্যক্তিগণকে ইমামে জামানা (আঃ)-এর সেবক ও তাঁর পরিবারের সদস্য বলা যেতে পারে। যাঁরা ইমামের জন্য কাজ করেন, আর তাঁরা দিন ও রাতে প্রতিটি মুহূর্তে ইমামে জামানার নির্দেশ পালনের জন্য অপেক্ষামান। এই ব্যক্তিগণের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য কিছু দায়িত্ব রয়েছে। রেওয়ায়েতে তাঁদেরকে সম্ভবতঃ আব্দাল, ওয়াতাদ, রেজালুল গায়েব, নোক্বাবা ও নোজাবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। শরীয়তেও তাঁদের নাম আব্দাল, আওতাদ, সাইয়াহ্ (উপাসক, রোজাদার) এবং উব্বাদ, মুখলিসীন, জুহ্হাদ, (প্রচেষ্টাকারী) ও মোজতাহিদ ইত্যাদি বলা হয়েছে।[2]

দ্রষ্টব্য: আমাদের দায়িত্বও এই সাধারণ মানুষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যা পরে উল্লেখ করা হবে।

৩. হাদীসের বর্ণনাকারী, শাসক, বিচারক ও ফক্বীহগণের দায়িত্ব

‘رواتِ حديث-রওয়াতে হাদীস’ মানে হাদীসের বর্ণনাকারী। হাদীসের বর্ণনাকারী, শাসক, বিচারক ও ফক্বীহ, এঁদের প্রত্যেকের একে অপরের সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে রয়েছেন যে, তাঁরা সমকালীন ইমামকে চেনেন এবং তাঁর পবিত্র উপস্থিতি থেকে সর্বদা বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার সমাধান বের করে আনেন। আর (স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায়) হযরতের অনুমতি ও অনুগ্রহে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। উপকৃত হয়ে সরাসরি তাঁদের সমস্যার সমাধান পান।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কিছু লোক হাদীস বর্ণনাকারী, শাসক ও ফক্বীহদের মাধ্যমে ইমামের সাথে তওয়াস্সুলের সৌভাগ্য রাখেন। আর কিছু লোক তো কোনো সংযোগ বা উপায় ছাড়াই তাঁর সাথে অভ্যন্তরীণভাবে সাক্ষাৎ করার উপায় রাখেন। আর অবশিষ্ট লোকেরা কখনোই তাঁর সাক্ষাৎ পায় না, না ব্যক্তিগত বা বাহ্যিকভাবে, আর না অভ্যন্তরীণভাবে। তবে ইমাম (আঃ)-এর বেলায়েত, তাঁর মহব্বত ও মওয়াদ্দাত অন্তরে ধারণ করে থাকলে সাক্ষাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দ্রষ্টব্য: গায়বতে কুবরার জামানায় যারা অবস্থান করছে তাদের ইমামের মারেফাতের বিষয়ে বিভিন্ন স্থান রয়েছে। আর এরা হলো ঐ সকল লোক যারা বিশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের সকলের জন্য আবশ্যিক ও সুস্পষ্ট দায়িত্ব রয়েছে যে, তারা যেন এই দায়িত্ব পালন করে এবং অবহেলার উপত্যকায় বিচরণ না করে, যাতে হযরতের অনুগ্রহের ও মনোযোগের ছায়াতলে অবস্থান করতে পারে।[3]

তবে এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, গায়েবতে কুবরার জামানায় যে কোনো ব্যক্তি ইমামের অনুগ্রহের যে কোনো পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকুক না কেনো কোন প্রকার সাক্ষাৎ ও দর্শনের দাবী করতে পারে না, এটা অসম্ভব। গায়বতে কুবরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কেবলমাত্র

[1] *উসূলে কাফী, কিতাবুল হুজ্জাত, বাবুল গায়বাত।*

[2] *পাইওয়ান্দে মানাবী বা সাহাতে ক্বুদসে মাহদাবী, পৃঃ ২৪।*

[3] *পাইওয়ান্দে মানাবী বা সাহাতে ক্বুদসে মাহদাবী, পৃঃ ২৫।*

তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, তাই যে সাক্ষাতের দাবি করবে সে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবে সম্মানিত লেখক, মরহুম সদরুল ইসলাম আলী আকবর হামাদানী তাঁর পুস্তক ‘পাইওয়ান্দে মানাবী বা সাহাতে ক্বুদসে মাহদাবী’ এবং ‘তাকালীফুল আনাম ফী গাইবাতিল ইমাম’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ৬০টি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সবগুলো উল্লেখ করার সুযোগ নেই। তাই এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করব।

প্রথম দায়িত্ব:

প্রত্যেক যুগে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রত্যক্ষ হুজ্জাত বা প্রতিনিধির উপস্থিতি বিশ্বাস করা ওয়াজিব

এই দায়িত্বের সাথে সাথে হযরত মাহদী (আঃ)-এর মারেফাত ও তাঁর উপস্থিতি ও অস্তিত্বের আক্বীদা এবং গায়বতে সুগরায় তাঁর চারজন বিশিষ্ট নায়েবের আক্বীদা রাখা ওয়াজিব।[1] গায়বতে কুবরাতে إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً আমি জমীনের বুকে (আমার) খলীফা (প্রতিনিধি) বানাতে চলেছি।[2] এই আয়াতের আলোকে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি থেকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বা কেয়ামতের পূর্বে চল্লিশ দিন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত।[3] আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীতে তার উত্তরাধিকারী স্থাপন ও নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের দৃষ্টান্তে পৃথিবী একটি মুহূর্তের জন্যও হুজ্জাত-শূণ্য হবে না। সে হুজ্জাত বা প্রতিনিধি প্রকাশ্যে থাকুন বা প্রচ্ছন্নে, মানুষ তাঁকে চিনুক বা না চিনুক। যাতে মানুষ আল্লাহর সামনে কোনো প্রকার অজুহাত খাড়া না করতে পারে।

বর্তমান যুগের লোকেরা যদি বলে যে, আমাদের জন্য কোনো আল্লাহর প্রতিনিধি নেই, তবে তা মিথ্যা কথা। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকালের সময় একটি নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তাঁর পরে তাঁর হতে বঞ্চিত উম্মত যেন সেই নির্দেশনার উপরে আমল করে। একইভাবে আমীরুল মো’মেনীন (আঃ) এবং প্রত্যেক যুগে নবীপাকের প্রত্যেক ওয়াসী যাঁরা প্রত্যেক যুগে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে আগমন করতে থেকেছেন তাঁরা উম্মতের জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছেন। এভাবে যখন হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর শাহাদাতের সময় সন্নিকট তখন তিনি তাঁর পরবর্তী হুজ্জাতের জন্য বিশেষভাবে একটি নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র হুজ্জাত ইবনিল-হাসান আল-আসকারী (আঃ)-কে হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মতো শৈশবেই ইমামত ও বেলায়েতের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

বিশ্বস্ত শেখ মোহাম্মাদ বিন উসমান আম্রাভীর ভাষায় সহীহ সনদসহ দেখুন, তিনি বলেন: হাসান ইবনে আলী (আঃ) একদিন তাঁর পুত্র মোহাম্মাদ মাহদী (আঃ)-কে আমাদের সামনে পেশ করলেন এবং আমাদেরকে সেই পবিত্র সত্ত্বার যিয়ারত করালেন। আমরা চল্লিশ জন ছিলাম যারা তাঁর পবিত্র গৃহে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আসকারী (আঃ) বললেন, এই আমার পুত্র, এই পুত্র আমার পরে তোমাদের ইমাম ও নেতা এবং তিনি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর খলীফা। তাঁর হুকুম মান্য করো এবং আমার পরে ছত্রভঙ্গ হয়ো না এবং অন্য পথ অবলম্বন করো না, এর অন্যথা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে আজ থেকে তোমরা আর মোহাম্মাদ মাহদীকে দেখতে পাবে না।[4]

তাই প্রথম দায়িত্ব হলো ইমামে জামানা (আঃ) ও তাঁর পবিত্র অস্তিত্বের প্রতি এবং

[1] *চারজন বিশিষ্ট নায়েবের বিষয়ে জানতে এ্যাসোসিয়েশন অফ ইমাম মাহদী-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত পুস্তক ‘নওয়াবে আর্বায়া’ অধ্যয়নযোগ্য।*

[2] *সূরা বাক্বারাহ, আঃ ৩০।*

[3] *উসুল কাফী, কিতাব আল-হিজ্জাহ, অধ্যায় ইন-আরজ লাত-খালওয়া মিন হিজ্জাহ, পৃঃ ১৭৮।*

[4] *কামালুদ্দীন, অধ্যায় ৪৩, পৃঃ ৪৩৫, হাঃ ২।*

গায়বতে সুগরাতে তাঁর নিযুক্ত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয় দায়িত্ব:

ঘুমানোর পূর্বের আদব

উক্ত দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি হলো ঘুমানোর পূর্বে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা। দিন-রাত, সর্বদা একজন ব্যক্তির উচিত ইমামে জামানা (আঃ)-এর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, আর সর্বদা আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি আমরা জিয়ারতে জামেয়া কাবীরা পাঠ করাকালীন স্বীকার করি যে, مُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ أَحْوَالِي وَ أُمُورِى...طَلِبَتِي وَ حَوَائِجِي وَ إِرَادَتِي فِي كُلِّ অর্থাৎ: আমি আমার সমস্ত চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা আপনাকে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।[1]

এই বাক্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, যুগের ইমামকে প্রত্যেক কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এবার একটু দোয়ায়ে কোমায়েলের এই বাক্যটির প্রতি মনোযোগ দিন, কীভাবে আমরা দিনরাত আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতে চাই: يا رَبِّ اَسْئَلُکَ بِحَقِّکَ وَ قُدْسِکَ اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتی مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِکَ مَوْصُولَةً وَ اَعْمالی عِنْدَکَ مَقْبُولَةً حَتّٰی تَکُونَ اَعْمالی وَ اَوْرادی کُلُّها وِرْداً واحِداً وَ حالی فی خِدْمَتِکَ سَرْمَداً... অর্থাৎ: হে আমার রব! আমি তোমার পবিত্রতা এবং তোমার ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার স্মরণে দিন-রাতের সমস্ত ঘন্টা পরিপূর্ণ করে দাও, তোমার সেবায় আমাকে নিরন্তর সাফল্য দান করো এবং আমার কাজগুলি তোমার সান্নিধ্যে গ্রহণযোগ্য করো। আমার সমস্ত কাজ কেবল তোমার জন্য এবং আমার পরিস্থিতি সর্বদা তোমার সেবায় নিবেদিত হোক।[2]

ঔদাসীন্য থেকে সচেতনতা

কতই না সৌভাগ্যবান সেই লোকেরা যাদের এই দোয়া কবুল হয় এবং তারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকে এবং তাঁর সেবা করার এবং তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার অবিরাম অনুমতি পায়। আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটি সুযোগ দান করুন এবং আমাদেরকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ ও সংযুক্তির সুযোগ দান করুন।

রাত্রিগুলোকে দোয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন অপেক্ষমান ব্যক্তিকে রাতে ঘুমানোর সময় কি করা উচিত যাতে সে তার যুগের ইমামের সাথে দেখা করতে পারে? এ বিষয়ে পঞ্চম ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) খুবই সহজ ও সরল পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে ক্বোরআনের 'মুসাব্বাহাত'[3] তেলাওয়াত করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে হযরত ক্বায়েম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎলাভ করবে। আর যদি সে মারা যায় তবে সে নবী (সঃ) এর সান্নিধ্যে থাকবে।[4]

দ্রষ্টব্য: সত্যি কতই না সৌভাগ্যবান তারা যারা এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ এবং তাদের যুগের ইমামকে তারা উপলব্ধি করে।

---

1 যিয়ারাতে জামেয়া কাবিরা, মাফাতিহুল জিনান, আল্লামা জিশান হায়দার জওয়াদী কর্তৃক উর্দু অনুবাদ, পৃঃ ১০০৬।

2 দোয়ায়ে কোমায়েল, মফাতিহুল জিনান, পৃঃ ১১৯-১২০।

3 মুসাব্বাহাত হলো ক্বোরআনের সেই সূরাগুলি যেগুলি সাব্বাহা, ইয়োসাব্বিহু, সুবহান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা শুরু হয়। যেমন: সূরা বনী ইস্রাঈল, হাদীদ, হাশর, সাফ্ফ, জুমা, তাগ্বাবুন, আ'লা ইত্যাদি সূরা।

4 উসূলে কাফী, খঃ ২, পৃঃ ৬১৯, হাঃ ৩।

তৃতীয় দায়িত্ব:

জাগ্রত অবস্থার আদব

জাগ্রত অবস্থার আদব হলো আপনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠবেন, তখন আপনার প্রথমে যা করা উচিত তা হলো নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করতঃ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেন: আল্লাহর রসূল (সঃ) যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَانِیْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِیْ وَاَلَیْہِ النُّشورُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবো।[1]

তারপর ইমামে জামানা (আঃ)-কে স্মরণ করুন এবং তিনবার বলুন: صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْکَ یا صَاحِبَ الزَّمَانِ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ، الحمد لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَانِی بِوِلَایَتِکَ وولایۃِ آبَائِکَ الطّاھرِین হে যুগের ইমাম! আপনার উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক। প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর, যিনি আপনার এবং আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ভালোবাসার নির্দেশনার সাথে একটি নতুন জীবন দান করেছেন।

দ্রষ্টব্য: ঐ সমস্ত লোকদের ভাগ্য কি হবে যারা রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)-এর জন্য জেগে ওঠে এবং এই যিকরগুলো পাঠ করে এবং ইমামে জামানা (আঃ) এবং চৌদ্দ মাসূমীনের সকলের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সাথে অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত হয়।

আজকের এই জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্বে খুব কম লোকই আছে যারা এই দায়িত্বগুলো পালন করে এবং তাদের যুগের ইমামের সাথে বিশেষ সংযোগ রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকেও এমন তৌফীক্ব দান করো এবং মাহদাবির পবিত্র প্রাঙ্গনে আমাদের অনুরূপ আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করার অনুমতি দাও।

এই নিবন্ধে আমরা তিনটি দায়িত্ব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ইনশাআল্লাহ, যদি আয়ু দীর্ঘ হয়, আমরা পরবর্তী সংখ্যায় আরও দায়িত্বের উপর আলোকপাত করবো।

১৮ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ

হারূন রশীদের স্ত্রী জুবাইদাহ, (হারূন যখন জানতে পারলো যে, পারলো যে, তার স্ত্রী শিয়া তখন সে জুবাইদাকে তালাক্ব দিয়ে দিয়েছিল, যেমন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে ঘটেছিল) উম্মে খালিদ, উম্মে সাঈদ, হাবানা ও উম্মে খালিদ। এই নয়জন মহিলা হলেন তাঁরা যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন। এই রেওয়ায়েতটি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে এটাও স্পষ্ট করে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন তখন শুধুমাত্র পুরুষদেরই যে, রাজআৎ হবে তা নয়, বরং নারীদেরও রাজআৎ হবে। ইমাম (আঃ) ৪জন মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। আর সম্ভবতঃ এই কারণে যে, উক্ত চারজন মহিলারা ভবিষ্যত প্রজন্মের হবেন। এমনও হতে পারে যে, ইমাম ৪জনের নাম উল্লেখ করেননি এ কারণে যে, যাতে ভবিষ্যৎ নারীরা তাদের ঈমান ও আমল এবং চরিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীর দ্বারা এই বরকতময় নারীদের সাথে যোগ দিতে পারেন। রেওয়ায়েতে ৫০জন নারীর কথা বলা হয়েছে, ইমাম মাত্র ৯জনের কথা বলেছেন। যে ৪১জন মহিলার নাম প্রকাশ করা হয়নি। এটি মহিলাদেরকেও আকৃষ্ট করার জন্য যে, তারাও নিজেদের ঈমান ও আমলের দ্বারা এই ৩১৩জনের সাথে যোগ দিতে পারে। যাই হোক এটা স্পষ্ট যে, হযরত ইমাম মাহদী যখন আবির্ভূত হবেন তখন মহিলারাও তাঁর সাথে থাকবেন। (এই রচনাটি আল-মওউদ নামক পত্রিকার ৭ নং সংখ্যার দউরুল মারআতু ফিল ক্বেয়ামিল মাহদী শিরোনামের প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত যেটি ১৪৪০ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আল্লাহ সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

[1] *উসূলে কাফী, খঃ ২, পৃঃ ৫৩৮, হাঃ ১৬।*

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ‘আনসার’ (সাহায্যকারী) রমণীদের ভূমিকা

নারীরা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের প্রয়োজন ও প্রভাব শুধু দাম্পত্য জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

নারীরা যেমন ঘরগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে পরিবারকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে তার পাশাপাশি পুরো সমাজকেও সাজিয়ে গুছিয়ে ও এক সূত্রে বেঁধে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের কোলই হলো পাঠশালা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এই কোলই হলো প্রশিক্ষণ স্থল ও চরিত্র নির্মাণের কারখানা। এই কোলেই সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গর্ব করার মতো ব্যক্তিত্বদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। বীর, বিক্রম, মহা-যোদ্ধা, নিবেদিতপ্রাণ সবই এই কোলেরই লালনকৃত। এই কোল থেকে বিপ্লবের দ্বীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। বিশ্বের সকল ইতিহাসবিদ, আলেম, হাদীস বিশারদ, আইনবিদ, কবি, বিজ্ঞানী, গবেষক, রাজনীতিবিদ, শাসক, বাদশাহ সকলেই এই কোলের কাছে ঋণী। যদিও সকল নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী খুনি, সন্ত্রাসী, দাঙ্গাবাজ, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীও এই কোল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মোটকথা, মানব ইতিহাসে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়...।

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাদের ত্যাগ, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, উৎসর্গ, নিবেদন অত্যন্ত প্রকট। পবিত্র ক্বোরআন ও ইতিহাস বিশেষভাবে কয়েকজন নারীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। উদাহরণস্বরূপ:

১. হযরত মূসা (আঃ)-এর মা।

২. হযরত আসিয়া বিনতে মাযাহিম, ফেরাউনের স্ত্রী।

৩.. হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা জননী হযরত মরিয়ম।

৪. হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মা জননী হযরত হাজেরা।

৫. হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী রাণী বিলক্বীস

৬. হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মা জননী হযরত আমেনা বিনতে ওয়াহ্হাব।

৭. নবীপাক (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মুল মো’মেনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিনতে খওয়ায়লাদ।

৮. আমীরুল মো’মেনীন হযরত আলী (আঃ)-এর মা জননী হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ।

৯. হযরত ফাতেমা যাহরা বিনতে নবী (সঃ)।

১০. হযরত জয়নাব বিনতে আলী (আঃ)।

১১. ইমামে জামানার মা জননী হযরত নারজিস খাতুন

নারীদের এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে ইসলামে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন এবং যাঁরা ইসলাম ও বিশেষ করে আহলে বাইতের মহান সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

প্রশ্নটি হলো হযরত ইমামে জামানার ৩১৩ জন ঐ বিশিষ্ট সাথী যাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অভ্যুত্থান করবেন তাঁদের মধ্যে কি কোনো নারী রয়েছেন?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর হবে। যথা: (১) সাধারণ উত্তর (২) বিশিষ্ট উত্তর।

সাধারণ উত্তর

(ক) পৃথিবীতে এমন কোনো আন্দোলন ও অভ্যুত্থান নেই যেখানে নারীরা জড়িত হয়নি এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেনি।

(খ) ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই যৌথভাবে দায়িত্বশীল করেছে। ইসলামের সকল নিয়ম-কানুন শর্তসাপেক্ষে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরজ বা ওয়াজিব। জেহাদ ছাড়া নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, খুমস, আমরবিল মারূফ, নেহি আনিল মুনকার (সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে বাধা দান) ইত্যাদি সবই তাদের উপরেও ওয়াজিব। যেমন ‘আমরবিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার’-এর বিষয়ে মহান রব্বুল আলামীনের বাণী হলো: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ

اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ মো'মিন পুরুষ ও মো'মিন নারী পরস্পরের বন্ধু, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ ঐ লোকদের প্রতি রহম করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্মানিত ও প্রজ্ঞাময়।[1]

অনুরূপ সূরা আহযাবের ৩৫-৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মো'মিন পুরুষ ও মো'মিনা নারী, আনুগত্যকারী পুরুষ ও আনুগত্যকারিণী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, খোদাভীরু পুরুষ ও খোদাভীরু নারী, গরিব-মিস্কীনদের যত্ন নেওয়া পুরুষ, গরীব-দুঃখিদের যত্নকারিণী নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, পবিত্র পুরুষ ও সতী নারী, আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণকারিণী নারী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আর কোন মো'মিন পুরুষ বা মো'মিন নারীর এই অধিকার ও কর্তৃত্ব নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন নিজেদের কোনো মত ব্যক্ত করবে, আর যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করবে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হবে।

[1] *সূরা: তওবাহ্, আঃ ৭১।*

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, পবিত্র ধর্ম ইসলামে নারীর দায়িত্ব ও তাদের ভূমিকা কোনো অবস্থাতেই পুরুষের চেয়ে কম নয়।

হযরত ওয়ালী আসর (আঃ)-এর আলোকিত আবির্ভাব হবে সকল ইসলামী শিক্ষার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে নারীরা এই বিশ্বব্যাপি অভ্যুত্থান ও বিশ্বব্যাপি শাসন ব্যবস্থার অংশি হবে না? আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাবের জন্য ভূমি প্রস্তুত ও প্রশস্ত করা যেমন পুরুষের দায়িত্ব তেমনি নারীরও দায়িত্ব রয়েছে। হযরত ওয়ালী আসর (আঃ)-এর ব্যাপারে পুরুষের যেমন দায়িত্ব নারীরও তেমন। দায়িত্ব একই, দায়িত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন, একজনের ক্ষেত্র জেহাদের ময়দান, সে হবে ময়দানের সিপাই। আর একজনের ক্ষেত্র তার ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ও সমাজ, তিনি এই ক্ষেত্রের সিপাই, অর্থাৎ এই ঘরে বসেই তিনি সৈন্য, আত্মোৎসর্গকারী, নিবেদিতপ্রাণ ও রথি-মহারথি লালন করবেন।

বিশিষ্ট উত্তর

এসব সাধারণ যুক্তি থাকা সত্ত্বেও রেওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বাহিনীতে মহিলারা থাকবেন। সুতরাং নিম্নের রেওয়ায়েতের প্রতি মনোযোগ দিন! হযরত জাবির জা'ফী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময়কার অবস্থা ও পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম (আঃ) বলেন: وَ يَجِيءُ، وَ اَللَّهِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فِيهِمْ خَمْسُونَ اِمْرَأَةً يَجْتَمِعُونَ بِمَكَّةَ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ قَزَعاً كَقَزَعِ اَلْخَرِيفِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ هِيَ اَلْآيَةُ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اَللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আর তিনি আসবেন, আর আল্লাহর শপথ তাঁর সাথে ৫০জন মহিলাসহ ৩০০জন লোক থাকবে। এরা সকলে কোন পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়াই মক্কায় জড়ো হবে, যেভাবে শরতের বাতাসে গাছের নীচে পাতা

জড়ো হয়। তারা একে অপরের পাশে থাকবে। এটি সেই আয়াতের অর্থ যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً-তোমরা যেখানেই থাক না কেনো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[1]

فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِم وَ هِيَ اَلْقَرْيَةُ اَلظَّالِمَةُ أَهْلُهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ اَلثَّلاَثُمِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ يُبَايِعُونَهُ بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ ، وَ مَعَهُ عَهْدُ نَبِيِّ اَللَّهِ وَ رَايَتُهُ وَ سِلاَحُهُ وَ وَزِيرُهُ مَعَهُ، فَيُنَادِي اَلْمُنَادِي بِمَكَّةَ بِاسْمِهِ وَ أَمْرِهِ অতঃপর আলে মোহাম্মাদ হতে এক ব্যক্তি ডেকে বলবেন, এটি সেই জায়গা যার অধিবাসীরা নিষ্ঠুর, তারপর তিনি মক্কা থেকে যাত্রা করবেন তিনশতর অধিক লোক তাঁর সাথে থাকবে| আর মাকামে ইব্রাহীম ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে তারা তাঁর বরকতময় হাতে আনুগত্যের অঙ্গীকার করবে এবং তাঁর কাছে আল্লাহর রসূলের আহদ নামা বা চুক্তিপত্র থাকবে। তাঁর পতাকা, তাঁর অস্ত্র এবং তাঁর মন্ত্রী তাঁর সাথে থাকবে। এমন সময়, মক্কার আকাশ থেকে একজন বার্তাবাহক তাঁর নাম এবং তাঁর কর্মসূচীর বিষয়ে ঘোষণা করবে, যা পৃথিবীর সকল প্রান্তের সমস্ত মানুষ শুনতে পাবে।[2]

সুতরাং এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে "৫০জন মহিলা" থাকবেন। এই রেওয়ায়েতটি ছাড়াও আরও অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে যেখানে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রাথমিক সাথীদের সংখ্যা ৩১৩ বলা হয়েছে। এঁরাই হলেন সেই নির্বাচিত ও মনোনীত মানুষ যাঁরা ইমামের আবির্ভাবের সূচনা থেকেই তাঁর সাথে থাকবেন| নিশ্চিতরূপে এই ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত উচ্চ গুণ ও মানসম্পন্ন হবেন, তাঁদের সৎকর্ম ও আখলাক্ব-চরিত্র নিশ্চয় উচ্চপর্যায়ের হবে। তারপর ধীরে ধীরে সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে| হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-কে উক্ত ৩১৩জনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাঁদের কিছু গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করেন: اُطْلُبْهُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ أُولَئِكَ الْخَفِيضُ عَيْشُهُمُ الْمُنْتَقِلَةُ دَارُهُمْ الَّذِينَ إِنْ شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَ إِنْ مَرِضُوا لَمْ يُعَادُوا-وَ إِنْ خَطَبُوا لَمْ يُزَوَّجُوا وَ إِنْ مَاتُوا لَمْ يُشْهَدُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ يَتَوَاسَوْنَ وَ فِي قُبُورِهِمْ يَتَزَاوَرُونَ وَ لَا إِنِ تَخْتَلِفُ أَهْوَاؤُهُمْ وَ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এই লোকদের সন্ধান করে দেখো, তাদের জীবনযাপনের ধরণ অত্যন্ত সাদামাটা, তারা এক জায়গায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না। মানুষের মাঝে থাকলে তাদের চেনা যায় না, দেখা না গেলে মানুষ তাদের খোঁজ নেয় না, অসুস্থ হলে মানুষ তাদের দেখতে যায় না, বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গেলে মানুষ তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না, তারা মারা গেলে মানুষ তাদের জানাযায় শরীক হয় না, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে অন্যদের সাহায্য করে, একে অপরের কবর পরিদর্শন (যিয়ারত) করে, সব থেকে বড়ো কথা হলো তারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ও একে অপরকে না চেনা সত্ত্বেও তাদের চিন্তা-চেতনা ও উদ্দেশ্য একে অপরের থেকে পৃথক নয়।[3]

আবারও বলছি যে, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সূচনা লগ্নের সাহাবীদের সংখ্যা বদরের সাহাবাদের মতো ৩১৩জন বলা হয়েছে।

মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে, যে ৫০জন মহিলার কথা বলা হয়েছে এই ৫০জন মহিলা ৩১৩জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নাকি এই ৫০জন মহিলা ৩১৩ জনের বাইরে? এভাবে রেওয়ায়েতের অর্থ হলো যখন ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর সাথে ৩১৩জন পুরুষ ও ৫০জন মহিলা থাকবেন। অর্থাৎ সেই সময় মোট সাহাবীর সংখ্যা হবে ৩৬৩জন, রেওয়ায়েত দ্বারা বাহ্যিকভাবে এটাই

---

[1] সূরা: বাক্বারাহ্, আঃ ১৪৮।

[2] তাফসীরে আইয়াশী, খঃ ১, পৃঃ ৬৫।

[3] গায়বাতে নো'মানী ২০৩।

স্পষ্ট হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে হতে পারে এই ৫০জন নারীর গুণ ও বৈশিষ্ট্য হবে অন্য কিছু। তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এই ৫০জন মহিলাও ঈমান, আমল, নৈতিকতা এবং সৎকর্মে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

এমনও হতে পারে যে এই ৫০জন মহিলা ৩১৩জনের অন্তর্ভুক্ত, তাই আবির্ভাবের সময় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে ৩১৩জন পুরুষ এবং ৫০জন মহিলা থাকবেন। এক্ষেত্রে এই নারীরা ঈমানে, কর্মে ও অন্যান্য গুণে পুরুষের সমান হবেন, এক্ষেত্রে তারা হবেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীলা নারী।

তবে বিষয় হলো রেওয়ায়েতে যে ৩১৩ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা 'রাজল' 'রিজাল'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং রিজালের আপাৎ অর্থ হচ্ছে একজন পুরুষ। এখন দেখা যাক অভিধানে "রাজল" শব্দের অর্থ কী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই "রাজল" শব্দটি কি সর্বদা নারীদের তুলনায় পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত হয় নাকি সাহসী ও নির্ভীক অর্থে এই "রাজল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়? যুদ্ধে সাধারণত পুরুষদের বীরত্ব সামনে আসে, তাই সাহসী ব্যক্তিদেরকে "রাজল" বলা হয়।

"তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরুল ক্বামূস" নামক বিশ্বস্ত এক অভিধানে "রাজল"-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। و قد يكون الرجل صفة يعنى به الشدة و الكمال- আর কখনো কখনো "রাজল" একটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ তীব্রতা এবং পরিপূর্ণতা।

পবিত্র ক্বোরআনে, সূরা বাকারার ২৩৯ নং আয়াতে "রিজাল" পদাতিক সৈনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا সুতরাং যদি তোমরা শত্রুকে ভয় পাও, তাহলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে নামায পড়ো।

এর ভিত্তিতে রেওয়ায়েতে যে ৩১৩জন পুরুষের উল্লেখ হয়েছে তা শুধু পুরুষ বোঝায় না, বরং সাহসিকতা ও নির্ভিকতাও বোঝায়। এ ক্ষেত্রে فهم خمسون امرأة তাদের মধ্যে ৫০জন নারী থাকবেন এই ৩১৩জনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা।

সূরা জ্বীনের ৬ নং আয়াতে এরকম রয়েছে: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا আর মানুষের পুরুষরা জিনদের পুরুষদের কাছে আশ্রয় চাইত। সকলেই জানেন যে জিনদের মধ্যে কেবল পুরুষই নেই, নারীও রয়েছে, আর এমনটা নয় যে, জিনদের নারীদের তাদের পুরুষদের মতো প্রভাব নেই। সুতরাং এখানে "রিজাল" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য যার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) হতে বর্ণিত: يُكَرُّ مَعَ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ اِمْرَأَةً . قُلْتُ: وَ مَا يَصْنَعُ بِهِنَّ؟ قَالَ: يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَ يَقُمْنَ عَلَى الْمَرْضَى، كَمَا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ইমামে জামানার কাছে তিরিশজন মহিলা নির্দিষ্ট রয়েছে। আমি বললাম: তিনি তাদের দিয়ে কী করবেন? তিনি বললেন: তিনি তাদের দ্বারা আহতদের সেব-সুশ্রুষা করবেন এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করবেন, যেমনটি রসূলুল্লাহ তাদের দ্বারা করতেন।[1]

রেওয়ায়েতে বর্ণিত যে, ইমামে ক্বায়েম (আঃ)-এর সাথে ১৩জন মহিলা থাকবেন। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন তাদের কাজ কি হবে? তিনি বললেন: তারা আহতদের চিকিৎসা করবে এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ছিল। অন্য একটি রেওয়ায়েতেও ১৩জন মহিলার কথা বলা হয়েছে, এতেও ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেছেন যে, এই মহিলারা অসুস্থদের দেখাশোনা করবেন। আর উক্ত রেওয়ায়েতে সেই সব মহিলাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী মুফাযযল ইবনে উমর যখন সেই সব মহিলাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ইমাম এই নামগুলি বললেন: اَلْقِنْوَاءُ بِنْتُ رُشَيْدٍ، وَ أُمُّ أَيْمَنَ، وَ حَبَابَةُ اَلْوَالِبِيَّةُ، وَ سُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَ زُبَيْدَةُ ، وَ أُمُّ خَالِدٍ اَلْأَحْمَسِيَّةُ، وَ أُمُّ سَعِيدٍ اَلْحَنَفِيَّةُ، وَ صُبَانَةُ اَلْمَاشِطَةُ، وَ أُمُّ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيَّةُ রুশাইদ হিজরীর কন্যা ক্বিনওয়া, উম্মে আয়মান, হাবাবাতুল ওয়ালেবিয়াহ্, আম্মার ইয়াসিরের মা সুমাইয়া,

পরবর্তী অংশ ১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

[1] *ইসবাতুল হুদা বিন্নুসূসি ওয়াল মোজেযাত, খঃ ৫।*

আল্লাহর ন্যায় বিচারের অপেক্ষায়

বর্তমান যুগের ইমাম (আঃ)-এর জন্য সুসম্মানিত প্রতীক্ষারত, আধ্যাত্মিক জগতের সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যাঁরা তাঁদের আক্বা ও মাওলার জন্য দিনরাত পলকহীন নেত্রে অপেক্ষা করেছেন এবং তাঁদের নেতার স্মরণে ব্যাকুল রয়েছেন, আর আল্লাহর ও তাঁর প্রতিনিধির মহব্বতে অবিরাম অশ্রু বিগলিত নেত্রে অপেক্ষা করছেন, আর তাও এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যে, আমরা কবে আমাদের নেতার সাথী হয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবো!!! সেই মর্যাদাবান ও সম্মানীয় প্রেমিকরা যাঁরা ঈদুল ফিৎর, ঈদুল আযহা, ঈদে গাদীর এবং শুক্রবারে নোদবাহ্ অর্থাৎ শোক ব্যক্ত করে ইমাম (আঃ)-এর সামনে উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন। আর তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় সহকারে মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেন যে, হায় এমন কোনো উপায় কি নেই যদ্দ্বারা আপনার পবিত্র উপস্থিতি অবধি পৌঁছতে পারি? এমন বিশুদ্ধ ও আন্তরিক অনুভূতি সহকারে অপেক্ষামান ব্যক্তিদের আল্লাহ রক্ষা করুন।

আল্লাহর ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করাই এ কথা বলে দিচ্ছে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে দুই ভাগে বিভক্ত। একটি সেই গোষ্ঠী যে অন্যায়-অত্যাচার এবং উৎপীড়ন ও নিপীড়নের পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। আর ন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা তরবারি উত্তোলন করে রেখেছে। আর অপর গোষ্ঠী সেই সকল অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যারা আল্লাহর হেদায়েত ও তাঁর সুব্যবস্থার অনুসারী, শাসক গোষ্ঠী সর্বদা জুলুম ও নির্যাতনের দ্বারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব চালায়।

এই সুবিশাল পৃথিবীতে অনেক বিশালতা ছিল যখন ক্বাবীল নিজের হাতে হত্যা করা হাবীলের মৃতদেহ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ভাবছিল এটা নিয়ে কি করা যায়। একদিকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাবীল, অন্যদিকে ক্বাবীল, যে অত্যাচার ও অনাচারের বোঝা নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছিল। যুগের আবর্তন উভয় দিকেরই ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, একদিকে শুরু হয় হক্ব, সত্য ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠাকারী হাদীগণের পরম্পরা, অন্যদিকে অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন ও নিপীড়নের বন্যা বয়ে যেতে থাকে।

পৃথিবী যতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থেকেছে, অন্যায়-অত্যাচারের অন্ধকার ততই গাঢ় ও ঘন হতে থেকেছে। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও যারা নিজেদের অন্তরে ঈমানের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে তাদের কাছে একটি সরল ও উজ্জ্বল পথ স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে থেকেছে। পবিত্র ক্বোরআনে মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ভারসাম্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ন্যায় ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[1]

এই আয়াতে মহান প্রতিপালক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমি রসূলদেরকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং কিতাব ও মাপকাঠি দিয়ে প্রেরণ করেছি যার দ্বারা আপনি আপনার বুদ্ধিকে চিনতে, দেখতে এবং আলোকিত করতে পারেন। আর এসব এই জন্য যে, যাতে আপনি শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। আমরা বলতে চাই যে, আল্লাহর ন্যায়বিচার সমস্ত উপায় তো সরবরাহ করে দিয়েছে, তাই যারা এই পথ অনুসরণ করছে তাদের হৃদয়ে উৎসাহ থাকতে হবে, ধারাবাহিকতা এবং সাহসিকতার সাথে কাজ করতে হবে এবং একটি চমৎকার সমাজ ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ হতাশা ও নিরাশা যেন তাকে ভাবাতে না পারে যে, ঐশী ন্যায় ও ইন্সাফের ব্যবস্থা সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা। অতএব, মহান প্রতিপালক

---

[1] *সূরা: হাদীদ, আঃ ২৫।*

এই আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, কিতাব ও ভারসাম্য উভয়ই অবশিষ্ট আছে এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা এখনও এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাকি রয়েছে।

ইমামে জামানা (আঃ)-এর প্রতীক্ষা করা এবং তাঁর অভিমুখী হওয়া একটি স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগত উভয় প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যারা ইমামে জামানা (আঃ)-এর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং বেলায়েতের সীমানার দিকে পা বাড়ায়, এবং এই অনুভূতির সাথে অগ্রসর হয় যে, যার জন্য অপেক্ষা করছি তিনি হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবীতে একমাত্র বিশ্বজনীন সংস্কারক, যিনি হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাদের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ইবাদত কবুলিয়াতের কারণ, যিনি তাদের উন্নতির, সাফল্যের ও পূর্ণতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করছেন।

কিন্তু উক্ত বিশ্বজনীন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা যা "بَابُ اللهِ الَّذِى مِنْهُ يُؤْتَى--আল্লাহর সেই দ্বার যেখান থেকে দান করা হয়" সেই অবধি পৌঁছাতে গেলে ইমামের জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে তার সত্যতার প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। তারপরে হয়তো আপনি মহানবী (সঃ)-এর এই হাদীসটির বাস্তব রূপ হবেন, যে হাদীসে তিনি যুগের ইমামের অপেক্ষমানদের সম্পর্কে বলেছেন: সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আমার আহলে বাইতের ক্বায়েমের সাক্ষাৎ পাবে এবং তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আনুগত্য করতে থাকবে। তাঁর গায়বতে তাঁর প্রতি এবং তাঁর পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা তাঁদের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আর তারাই হবে আমার প্রিয় এবং আমার উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত লোক।[1]

অর্থাৎ প্রিয়জনেরা! জেনে রাখুন, ইমামে জামানার (আঃ)-এর পবিত্র প্রতীক্ষার পিছনে আরও অনেক অপেক্ষা লুকিয়ে রয়েছে, যা ইমামের পবিত্র আবির্ভাবে প্রকাশ পাবে।

ইমামে জামানার জন্য অপেক্ষা করা শুধুমাত্র তাঁর অপেক্ষা করা নয়, বরং খোদায়ী ন্যায়ের জন্যও অপেক্ষা করা, আল্লাহর আদেশাদি বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করা, হক প্রতিষ্ঠা ও প্রকট হওয়ার অপেক্ষা এবং বাতিল ও অসত্যের রহিত হওয়ার ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপেক্ষা।

দোয়ায়ে ইফতেতাহ্-এর বাক্যটি বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি এবং ক্বোরআন তেলাওয়াতের অনেকগুলি জানালা জ্বলজ্বল করছে। তাই এখানে থেমে আমি পাঠকদের জন্য কয়েকটি লাইন লিখতে চাই: এই দোয়াটির দুটি অংশ রয়েছে, একটি অংশ এই ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণের আহ্বান জানায়, যে শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র ঐশী ন্যায়বিচারের প্রভাব থাকবে, যা আমাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানায় যে, এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের শেষ ইমাম দ্বারা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় অংশটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে, যে সময়টি অতিবাহিত হয়েছে এবং যে সময়টি আসবে। আর সেই সময়-কালের মধ্যে এত পরিমাণে ভন্ডামী হবে যে, তার উদাহরণ এভাবে দিতে পারি যে, পৃথিবী হবে একটি পান পেয়ালা আর অপকর্ম, অশুভ, ভন্ডামী, শঠতা, অর্থাৎ সকল প্রকারের খারাপ বিষয়-বস্তুর শরাব যেন তার মধ্যে চলকাচ্ছে ও উপচে পড়ছে। এই দোয়াটি তিনি শিখিয়েছেন যাঁকে মহানবী (সঃ) বরকতময় শেষ মোহাম্মাদ নামে নামকরণ করেছেন। তিনি হলেন আমাদের যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)।

ইঙ্গিত: আমাদের আলেমগণ অনেক চেষ্টা করে স্পষ্ট করেছেন যে, মাসূমীন (আঃ)-এর পবিত্র মুখসৃত বাণী দোয়া অথবা অন্যভাবে ব্যক্ত হবে তার স্বপক্ষ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্বোরআনে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সুতরাং আমরা যখন ক্বোরআন তেলাওয়াত করি তখন আমাদের মনে এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, কত মহান ছিলেন

[1] *কামালুদ্দিন, খঃ ১, পৃঃ ২৮৬।*

আমার রসূল, যাঁর নাম ছিল মোহাম্মাদ। ক্বোরআনে উল্লেখ হচ্ছে: مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ মোহাম্মাদ একজন রসূল ব্যতীত নন। অর্থাৎ আমার মোহাম্মাদ শুধু রসূল আর রসূল। অন্য কথায়, তাঁর সমস্ত গুণাবলী রেসালতের মধ্যেই নিহিত। যার অর্থ হলো তিনি আল্লাহর হুকুম নিয়ে এসেছেন এবং তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ দোয়া পাঠ করার পর অন্তরে বাগ্মীতার অনুভূতি জাগে যে, আমরা ভাবি কেন শিরক ও কুফর শব্দের পরিবর্তে নেফাক্ব (ভন্ডামি) শব্দটি রাখা হলো? মুনাফিকরা নবী (সঃ)-এর আহলে বাইতের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং ফাঁদ পেতেছে তার সবই প্রকাশ্যে এসে যায়। তাই কবি তাঁর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে এরূপে তার বর্ণনা দিয়েছেন: "খেলাফতের সম্পর্ক ক্বোরআন হতে ছিন্ন হওয়া / স্বাধীনতার পান পেয়ালায় বিষ মেশিয়ে দেওয়া।" এই দোয়ার সূচনা ও মহিমা বর্ণনার আয়নায় বিবেচনার জায়গা রয়েছে যে, একটি ক্বওম রয়েছে, একটি জাতি রয়েছে, একটি সমাজ রয়েছে, যারা এই ভয়ঙ্কর ও ঝড়ো নদীতে তাদের নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে এই সব দুর্যোগ-দুর্ভোগ শেষ হয়ে যাবে এবং নৌকা হবে ঐশি ন্যায়ের তীরে। আর তারপর আমরা একটি উপত্যকায় প্রবেশ করব যেখানে তিনি শাসন করবেন। যার জন্য একটি দোয়াতে রয়েছে এবং দোয়ার ফলাফলও ইঙ্গিত দেয় যে, ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে যখন আমাদের ইমাম (আঃ)-এর জন্য অপেক্ষামানদের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা হবে। সেজন্য দোয়ায়ে ইফতেতাহ্-এর শেষ অংশে আমরা প্রতিপালকের নিকট অনুনয় করে বলি যে. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এমন এক ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থার প্রার্থনা করি যার দ্বারা তুমি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সম্মান দান করবে। যে ইসলামের জন্য মহানবী (সঃ) কষ্ট সহ্য করেছেন, এবং তাঁর আহলে বাইতের খাঁটি ও বিশুদ্ধ রক্ত দিয়ে সে ইসলাম-বৃক্ষকে সেচন করেছেন। আর সেই দ্বীনে ইসলাম ইমামে জামানর উজ্জ্বল আবির্ভাবের পর সকল ধর্মের উপর প্রাধান্যলাভ করবে। সুতরাং আমরা শুধু ইমামের জন্য অপেক্ষা করছি না, বরং আমরা অপেক্ষা করছি নবীর আহলেবায়েত (আঃ)-এর পবিত্র রক্ত দ্বারা সেচিত ইসলাম-বৃক্ষের সবুজ-শ্যামলতা। যার পরে বিশ্বব্যাপী কেবল একটিই আইন এবং একটিই শাসনব্যবস্থা থাকবে।

সকল মানুষ সকল মত ও পথ এবং সকল দ্বীন ও ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে উম্মতে ওয়াহেদাহ্ বা একটি জাতি হিসাবে একত্রিত হওয়ার ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পাবেই পাবে। মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনের একাধিক স্থানে যার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর এই তাগিদের পরিলক্ষ্যে বলা যায় যে, এই প্রতীক্ষা বিশ্বপালনকর্তার প্রতীক্ষা যে, কখন মানুষ প্রস্তুত হবে আর নির্ধারিত সময়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করবেন, কাফের ও মুশরিকরা এতে অসন্তুষ্ট হলেও।

এ কারণেই ক্বোরআনের সূরাগুলিতে যেমন: সূরা আম্বিয়া, নূর, ক্বসাস, সাফ্ফাত ইত্যাদিতে এবং অন্যান্য ক্বোরআনী সূরার আয়াতগুলিতে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই সাথে বিশ্বব্যাপি শাসনব্যবস্থার বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। একইভাবে রসূল (সঃ) ও মাসূমীন (আঃ)-এর হাদীসসমূহে সকল দলীল ও সনদসহ নির্ভরযোগ্য একটি পরম্পরা রয়েছে যা উম্মতে ওয়াহেদাহ্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যার মধ্যে শিয়া-সুন্নী সূত্রে বর্ণিত প্রসিদ্ধ এই হাদীসটি অন্যতম যেখানে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীর শেষ হওয়ার আগে যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তবে মহান আল্লাহ সেই দিনটিকে এত দীর্ঘায়িত করবেন যে, সেই দিনে প্রতিশ্রুত মাহদীর আবির্ভাব হবে এবং সমগ্র পৃথিবীকে ঐরূপে ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেরূপে তা অন্যায়-অত্যাচারে পরিপূর্ণ থাকবে। অতএব, যে প্রকৃতপক্ষে প্রতীক্ষাকারী হবে সে আল্লাহর বাণীর

এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের সত্যিকারের অনুসারী হবে। আর যে সত্যিকারের অনুসারী হবে সে কখনও এই ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করবে না, এমনকি সে সম্পর্কে সন্দেহ করা থেকেও বিরত থাকবে, কারণ যদি তার সামনে এমন কিছু আসে যে বিষয়ে তার জানা না থাকে যে, তা ইসলামের পরিধির মধ্যে কি না, তো সাথে সাথে সে সেটিকে ক্বোরআন ও আহলেবায়তের হাদীসের আলোকে দেখবে।

বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি পৃথিবীর বিছানা বিছিয়েছেন এবং তার উপর আকাশের ছাউনি স্থাপন করেছেন। যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর নিদর্শন রেখেছেন। যে প্রভু সব কিছুর জ্ঞান রাখেন এবং বিশুদ্ধ শক্তিধর, যিনি মানুষের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রতিটি বিষয়-বস্তুর জ্ঞান রাখেন ও প্রজ্ঞাবান, সেই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়ের পক্ষে কি সম্ভব নয় যে, তিনি ইমামের আবির্ভাবের সকল উপায় প্রস্তুত করে দেবেন আর পৃথীকে মুহূর্তে পরিবর্তন করে দেবেন?

জী হ্যাঁ, তিনি পারেন, তবে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি যখন এই পৃথিবীতে হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করলেন এবং ইবলিস তাঁর বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করল, তখন তিনি তাকে অবকাশ দিলেন এবং সে যখন আদম সন্তানদের ধোঁকা দেওয়ার শপথ করলো তখন মহান আল্লাহ বললেন: তুই কখনই আমার নেক ও সৎকর্মশীল বান্দাদের বিভ্রান্ত করতে পারবি না। মানুষকে তার কর্মাদি ও সিদ্ধান্তে স্বাধীন সৃষ্টি করা ঐশ্বরিক ইচ্ছার অন্যতম প্রয়োজনীয়তা। যদি শয়তান গোমরাহকারী হয় তো ইমামের দ্বারা আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিহাস এই পথকে নিরন্তর আলোকিত করতে থেকেছে, আর এ কারণেই শেষ পথপ্রদর্শককে আলোকিত সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তাঁকে মেঘের আস্তরণে ঢাকা সূর্যের সাথেও তুলনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়বতের যুগে হেদায়েতের সুব্যবস্থার পূর্ণ দর্শন ব্যক্ত করে। অন্য বাক্যে বলা যায় যে, এটি ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি, যা পূর্ণতা পাবেই এবং ক্বোরআনেও বলা হয়েছে: بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ আল্লাহর অবশিষ্ট তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মো'মিন হও।[1]

কিন্তু এই গায়বত আর এ সময়ের অপেক্ষা আসলে সেই পরীক্ষা যার ভিত্তিতে খোদায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, যা মুনাফিকদের থেকে মুক্ত হবে এবং জালেমদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত হবে। অন্যথায়, মহান আল্লাহর প্রিয় ধর্ম ইসলামের সূচনা হওয়া এবং প্রথম ঘোষণাতেই মুনাফিকরা তাদের মনোবাঞ্ছা পেশ করে ইসলাম বিরোধীতার প্রমাণ পেশ করেছিল। আর প্রথম দিন থেকেই অর্থ-সম্পদ ও রাজত্বের ক্ষুধার্ত চরিত্রহীনতায় অতি পরিচিত মুখগুলি মনে মনে তা ধ্বংস করার পরিকল্পনা শুরু করেছিল। তাই নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরপরই ইসলামের চিত্র বিকৃত করে ছাড়ল। আর তাদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টায় আলে মোহাম্মাদের বাগিচার কতক ফুলকে অকালে ঝরে যেতে হয়। তাই এই শেষ ব্যবস্থা যা ঐশী প্রতিশ্রুতির চূড়ান্ত এর পরীক্ষা ও অত্যন্ত কঠিন ও ভিন্নতর। আর এটি সে বুঝবে, যে ইমাম (আঃ)-এর গায়বতকালীন সময়ে মুনাফিকির চরম শত্রু হবে, ঐশী ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হবে, প্রভুর আদেশ-নিষেধের পালনকারী হবে, ক্বোরআনের বন্ধু হবে, নৈতিকতা ও সচ্চরিত্র যার পরিচয় হবে। এটিই সেই মাইল ফলক যা ন্যায়ের প্রতীক্ষাকারীর মধ্যে পরিলক্ষিত হবে।

পরবর্তী অংশ ৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

[1] *সূরা: হুদ, আঃ ৮৬।*

‘মাহদী ইজম’-এর উপর রাবেতায়ে আলাম-এ-ইসলামীর গবেষণামূলক প্রতিবেদন

১৫ শাবানুল মোয়াজ্জাম ২৫৫ হিজরীর বরকতময় প্রভাত ছিল যখন আল্লাহর শেষ পথপ্রদর্শক ও পথনির্দেশক এই পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। অর্থাৎ হযরত হুজ্জাত ইবনুল হাসান আল-আসকারী (আঃ) হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, যা ইবনে খালকানের মতো একশত বিশজন ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালক্বান ‘ওয়াফিয়াত আল-আয়ান’ নামক গ্রন্থে এবং মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ গাঞ্জী শাফেয়ী ‘আল-আখবার ফি সাহিবুয জামান’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[1]

যদিও মাহদাবিয়াতের মতবাদ, অর্থাৎ একজন সংস্কারক দ্বারা বিশ্বকে ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ করার আক্বীদা, কেবল ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এই আক্বীদা ও আকাঙ্খা মানব প্রকৃতিতেও পাওয়া যায়। তবে পবিত্র ধর্ম ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম, এবং যেহেতু এই বিশ্বাস অত্যাচারের অবসানের সুসংবাদের সাথে জড়িত, তাই অত্যাচারী শাসকরা সর্বদা এই বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে, তাই তারা যুগে যুগে মাহদী হওয়ার মিথ্যা দাবিদারদের ইন্ধন যুগিয়ে এই আক্বীদা বিশ্বাসকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। উক্ত সন্দেহ ও অপচেষ্টার মধ্যে একটি হল এই বিশ্বাসটিকে খাঁটি শিয়া বিশ্বাস বলা, কিংবা এটিকে একটি মিথ্যা কল্প-কাহিনী নামে আখ্যায়িত করা।

"রাবেতায়ে আলম-এ-ইসলামী" হলো একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা, যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এর প্রধান কার্যালয় হলো পবিত্র মদীনা শহরে। ১৩৯৯ হিজরীতে, কেনিয়ার আবু মোহাম্মাদ নামে একজন ব্যক্তি মাহদীবাদের আক্বীদা বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা হওয়ার বিষয়ে এবং নবীর হাদীস অনুযায়ী তা সত্য হওয়া ও ধারাবাহিক হওয়ার বিষয়ে "রাবেতা আলম-এ-ইসলামী" অফিসে যোগাযোগ করেন। অফিসের প্রধান, মোহাম্মাদ আল-মালিহ আল-কাজ্জাজ স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছেন যে "ইবনে তাইমিয়া, যিনি ওহাবি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের বিষয়ে হাদীসগুলি গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত পত্রিকার লেখাটি হিজাজ (বর্তমান সৌদি আরব)-এর পাঁচজন বিখ্যাত আলেম গবেষণা ও প্রামাণিক সূত্র ইত্যাদিসহ লিখেছেন যা আমরা পাঠকবর্গের জন্য উপস্থাপন করতে চলেছি:

“জগতে যখন বিদ্রোহ ও ফেৎনা-ফ্যাসাদ দেখা দেবে এবং কুফরী ও অত্যাচার ছড়িয়ে পড়বে, তখন মহান রব্বুল আলামীন মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে তা ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেভাবে তা অত্যাচার ও অবিচারে ভরে থাকবে। তাঁর আবির্ভাবের স্থানকে মক্কা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হবেন সেই বারোজন খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত হাদীস রসূল (সঃ) হতে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকজন সাহাবীর নাম হল:

১. উসমান ইবনে আফফান, ২. আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ), ৩. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, ৪. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, ৫. ফারাহ ইবনে আসাস সাজনী, ৬. আবদুল্লাহ ইবনে হারি, ৭. আবু হুরায়রা, ৮. হুযায়ফাহ

---

[1] *আলী দাওয়ানী প্রণীত গ্রন্থ ‘সুন্নী বুদ্ধিজীবী ও মাহদী মওদ’।*

ইবনে ইয়ামান, ৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, ১০. আবু ইমামা, ১১. জাবির ইবনে মাজিদ, ১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, ১৩. আনাস ইবনে মালিক, ১৪. ইমরান ইবনে হুসাইন, ১৫. নবীপাকের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)। এঁরা সকলেই মাহদী (আঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ছাড়াও আরও অনেকে রয়েছেন যাঁরা ইমাম মহদী (আঃ) সম্পর্কে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে। যেখানে মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের সমতুল্য বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা এই বিষয়টি সেই বিষয়ের মতো নয় যে বিষয়ে ইজতিহাদ করে কিছু বলা যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেই এসব কথা বলেছেন।

আরো লেখা হয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীসগুলো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালেহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। আর সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য, যা এখানে হাদীসের মান্যতা রাখে এবং সেগুলো অনেক বিখ্যাত ইসলামিক গ্রন্থে এবং হাদীসের মৌলিক কিতাবেও উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলো সুনান গ্রন্থহোক বা মুজাম গ্রন্থ হোক বা মুসনাদ গ্রন্থ হোক। যেমন:

১. সুনানে আবু দাউদ, ২. সুনানে তিরমিযী, ৩. ইবনে আমর আল-ওয়ালদানি, ৪. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ৫. মুসনাদে ইবনে ইয়ালা ও বাজ্জাজ, ৬. হাকিম নেশাপুরীর মুস্তাদরাক আল-সাহীহাইন, ৭. তাবরানী প্রণীত মু'জামুল কবীর ও মুজামুল মুতাওয়াস্সিত, ৮. রাউয়ানি ও দারক্বুৎনী, ৯. আবু নঈম প্রণীত আখবারুল মাহদী, ১০. তারীখে খতীবে বাগদাদী, ১১. তারীখ ইবনে আসাকির, ১২. তারীখে দামেস্ক ইত্যাদী। এ ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞজনদের গ্রন্থগুলিতে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে।

এর পরে আরও লেখা হয়েছে: কতিপয় ইসলামী পন্ডিত এ বিষয়ে নির্দিষ্ট বই সংকলন করেছেন, যেমন:

১. আবু নঈম রচিত আখবারুল মাহদী ২. ইবনে হাজর হাইছামী প্রণীত আল ক্বওলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদীইল মুন্তাযার, ৩. শওকানী প্রণীত আত্তাউযীহু ফি তাওয়াতুরি মা জায়া ফিল মুন্তাযার ওয়াদ্দাজ্জাল ওয়াল মসীহ্, ৪. ইদ্রীস ইরাকি মাগরিবী চরিত আল-মাহদী ৫. আবুল আব্বাস ইবনে আব্দুল মো'মিন আল-মাগরিবী রচিত আল-ওয়াহেমুল মাকনূন ফির রদ্দে আলী ইবনে খালদূন গ্রন্থটিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(এক গবেষণা অনুযায়ী, কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিষয়ে ২০৬৮টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[1]

আর সর্বশেষ যিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি হলেন মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের কয়েকটি সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আরও লেখা হয়েছে:

ইসলামের প্রাচীন ও আধুনিক বুজুর্গ ও পণ্ডিতদের একটি দল তাঁদের লিখিত নিদর্শনগুলিতে বলেছেন যে, মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত হাদীসগুলি তাওয়াতুরের সীমায় পৌঁছে যায়, যার পরে তা আর কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

তার মধ্যে যেমন: ১. সাখাভী 'ফাৎহুল মুগীছ' নামক গ্রন্থে, ২. মোহাম্মাদ বিন আহমদ সাফারিনী 'শারহুল আক্বীদাহ' গ্রন্থে, ৩. হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতি 'আল-হাবী' গ্রন্থে, ৪. ইদ্রীস ইরাকী 'আল-মাহদী' গ্রন্থে, ৫. শওক্বানী 'আত্তাওযীহ্ ফী তাওয়াতুরি মা জাআ ফীল মুন্তাযার' গ্রন্থে ৬. মোহাম্মাদ জাফর কাতানী 'নাজমুত্তানাসুর' গ্রন্থে,

পরবর্তী অংশ ২৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

[1] *কিতাব নামা ইমাম মাহদী (আঃ)।*

ক্বোরআনে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বর্ণনা

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ নিম্নোক্ত বইগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে:

১. সৈয়দ হাশিম বাহরানী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত 'আল-মাহজাতু ফি মা নাযালা ফিল ক্বায়েমিল হুজ্জাতু' গ্রন্থে আহলে সুন্নাহ ও শিয়াদের ব্যাখ্যাসহ প্রথমে একশত বিশটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং তারপর আরও আয়াত ১২টি আয়াত যোগ করেছেন।

২. 'বাশারাত আহদীন' গ্রন্থের লেখক মোহাম্মাদ সাদিক্বী সাহেব প্রায় দুইশত ষাটটি আয়াতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

৩. 'আল-মু'জামুল আহাদীসুল ইমামুল মাহদী' গ্রন্থের লেখক পঞ্চম খণ্ডে পাঁচ শতাধিক আয়াতে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে বলে উদ্ধৃত করেছেন।

পাঠকবৃন্দ, প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে আমরা আর বেশি বই উল্লেখ করছি না যে বইগুলোতে ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত আয়াতের উল্লেখ রয়েছে।

সুন্নী উলামা কর্তৃক ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে লিখিত বই

সেই পুস্তকের সংখ্যা অনেক বেশি যেগুলো আমাদের সুন্নী ভাইরা এবং নিষ্পাপ ইমামগণের সাহাবীরা লিখেছেন। আমরা কেবল কয়েকটির উল্লেখ করছি মাত্র:

১. সহীহ বুখারীর শিক্ষক জনাব নাঈম ইবনে হাম্মাদ কর্তৃক সংকলিত 'আল-ফিতান' এই পুরো গ্রন্থটি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপর লিখিত।

২. আহমদ বিন হাম্বলের শিক্ষক জনাব ইবনে আবী শাইবা কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ' দুই খন্ডের এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কিতাব আল-মাহদী'।

৩. বুখারীর শিক্ষক ইবাদ বিন ইয়াকুব রাওয়াগ্বানী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ 'আল-মাহদী'

৪. 'আল-মিশখা' হুসাইন ইবনে মাহবুব কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর গায়বতের একশ বছর পূর্বে লিখিত।

উপরোক্ত কিতাব ও অন্যান্য বই থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নাউযুবিল্লাহ মাহদীবাদের আক্বীদা শিয়াদের বানোয়াট বিশ্বাস বা কল্পকাহিনী নয়, বরং এটি একটি বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উপরোক্ত বইগুলোর মধ্যে অন্তত পক্ষে দুটি বই তো জনাব বুখারীর শিক্ষকদের। কিন্তু ইসমাঈল বুখারী সাহেব-- كيف انتم اذا أنزل ابنُ مريم وامامكم منكم তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন মরিয়ম তনয় তোমাদের সামনে অবতীর্ণ হবেন?[1]--এই হাদীসটি ব্যতীত মাহদী (আঃ)-এর বিষয়ে একটিও হাদীস তার সহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

পাঠকগণ! প্রবন্ধের বিস্তৃত রেফারেন্সের পরেও কি কেউ মাহদীবাদের আক্বীদাকে শুধুমাত্র শিয়াদের আক্বীদা বলে চালিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা করতে পারে? মাহদীবাদের মতবাদটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বারবার বর্ণিত আক্বীদা যে, এটির মিথ্যা দাবিদারও যুগে যুগে আবির্ভূত হতে থেকেছে। আর মিথ্যা বা নকলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, আসলটি বিদ্যমান।

আমাদের সকলের এবং বিশেষ করে আলেমদের দায়িত্ব হলো এই আক্বীদার সাথে জনগণকে এভাবে পরিচিত করানো যে, তারা যেন মাহদী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার যেমন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মির্জা আলী মোহাম্মাদ বাব শিরাজী, মাহদী বাঙ্গালী এবং মাহদী জৌনপুরীকে

[1] *বাবে নুযূলে ঈসা, অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর অবতীর্ণ হওয়ার অধ্যায়*

প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এমন না হয় যে, এই লোকেরা ভালো ভালো স্কুল খুলে, প্রভাবশালীদের ছেলেমেয়েদের স্কলার্শিপের নামে স্কুলের ফী কমিয়ে দিয়ে বা মকুব করে দিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে, জাঁক-জমকপূর্ণ ও মিউজিকে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে আমাদের এবং আপনাদের ঈমান কিনে না নেয়।

আমরা ইউসুফে জাহরা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। তাদের শত্রুরা যদি হেদায়েতের সামর্থ্য রাখে তবে তাদের পথ দেখাবে, অন্যথায় তাদের অপমানিত করে হত্যা করবে, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

২৪ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

আর ৭. আবুল আব্বাস ইবনে আব্দুল মোমিন 'আল অহেমুল মাকনূন' গ্রন্থে মাহদীবাদের আক্বীদার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

এই আলোচনার শেষে লেখা হয়েছে:

একমাত্র ইবনে খালদুনই একটি ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসের সমর্থনে মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত হাদীসের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছে। আর সেই জাল হাদীসটি হলো لا المهدى الا عيسى –মাহদী বলে কেউ নেই ঈসা (আঃ) ছাড়া। যদিও নবীপাকের বংশধারার নিষ্পাপ ইমামগণ এবং ইসলামের বড় বড় আলেমগণ তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশেষ করে ইবনে আব্দুল মো'মিন রচিত আল-অহেমুল মাকনূন ফির রদ্দে আলী ইবনে খালদূন গ্রন্থে, যে গ্রন্থটি ত্রিশ বছর পূর্বে এশিয়া থেকে ইউরোপ অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। আর হাদীসের হাফিজগণ এবং হাদীস বিশারদগণও এটা স্পষ্ট করেছেন যে, মাহদী (আঃ)-এর বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ ও হাসান হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, আর সেগুলোর সংগ্রহ 'ধারাবাহিক' অর্থাৎ হাদীসের পরিভাষায় যাকে মোতাওয়াতির বলা হয়।

এ সকল কারণে মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রতি ঈমান রাখা (প্রত্যেক মুসলমানের উপর) ওয়াজিব। আর এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদার অংশও। আর তা অজ্ঞ, নিরেট ও মূর্খ ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না।[1]

পাঠকবর্গ! এটি ছিল সৌদিজাত রাবেতা আলামে ইসলামী নামক সংস্থার পক্ষ থেকে মাহদীবাদ আক্বীদার বিষয়ে প্রামাণ্য উত্তর, যা আপনি দেখলেন। আমরা এটা আবশ্যক মনে করি যে, পাঠকবর্গকে মাহদীবাদ আক্বীদার বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলোও অবগত করি।

৩২ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

আর গুণাবলির জ্ঞান সহকারে হযরতের সাথে সংযোগ দৃঢ় করুন এবং একদিনের জন্যও যোগাযোগ ত্যাগ করবেন না, যে সবচেয়ে কাছের হয় সে সব থেকে দ্রুত শুনে নেয়, আর তিনি তো সবচেয়ে বেশি মহব্বতকারী। হযরত ইমামে জামানা (আঃ) এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই, যাঁরা আল্লাহর সৃষ্টির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন এবং আমাদেরকে এই গুণাবলীর সাথে হযরতের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর দাদা ও পূর্বপুরুষদের উপরে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

1 *ইসলামিক ফেক্বাহ সংস্থার প্রধান মোহাম্মাদ মুনতাসির কাতানী।*

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নাম ও উপাধি

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নাম ও উপাধি জানা আয়াত যিল ক্বুরবা অনুসারে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, কেননা নবীপাক (সঃ) রেসালতের পারিশ্রমিক বাবদ এই ভালোবাসাই চেয়েছিলেন আল্লাহপাকের নির্দেশে। এছাড়া এর দ্বারা আমরা ইমামে জামানা (আঃ)-এর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। আর এটা না জানা শুধুমাত্র হযরতের সাথে আমাদের ভাসাভাসা সম্পর্ক ও ভালোবাসাই প্রকাশ করে না, বরং ইহকাল ও পরকালে আমাদের ভারী ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় যে, আমরা আল্লাহর শেষ হুজ্জাত ও প্রতিনিধি, সকল নবী-রসূলের উত্তরাধিকারী ও মাসূমীনদের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে খুব কম অবগত, যা সত্যিকারেরই একটি বড় ক্ষতি। উপাধি একজন ব্যক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে এবং প্রেমীরা তাদের প্রিয়জনের বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে খুঁজে সেগুলি দ্বারা সম্বোধন করে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

বয়স্করা তো জানেন তবে কম বয়সীদের জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করলে আরও স্পষ্ট হবে। উদাহরণ স্বরূপ: 'اَلْوَالِدُ الشَّفِيق-মানে অনেক বেশি স্নেহকারী পিতা' এ কথার ইঙ্গিত দেয় যে, পিতারা তাদের সন্তানদের অত্যধিক ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে একটি স্বভাবজাত বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন কাউকে নামের পরিবর্তে ভালো উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা হয়, তখন সম্বোধনকৃত মানুষটি শুধু দ্রুত আকৃষ্টই হয় না, বরং আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। শুধু নাম ধরে ডাকলে হয়তো লক্ষ্য করা যেতো না। যেমন সন্তান মাকে শুধু মা বলে ডাকলে ততটা কার্যকর হবে না, যতটা ফলপ্রসূ হবে 'ওগো আমার মমতাময়ী মা' বলে ডাকলে হবে। এমন করে ডাকলে দেখা যাবে মা তাঁর দুই বাহু প্রসারিত করে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলবে: বলো আমার নয়ন মণি? এই ছোট ভূমিকা দিয়ে বলতে চাই যে, আজকে আমাদের নিবন্ধের শিরোনামের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. হযরতের বেশি বেশি উপাধি জানা এবং হযরতের গুণাবলী জেনে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

২, হযরতকে এইসব গুণ-বৈশিষ্ট্য ও উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হযরতের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উত্তম উপায়।

৩. এই উপাধিগুলি দ্বারা হযরতকে সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট সম্পদ।

৪. এই সুন্নতের অনুসরণ করা মহান রব্বুল আলামীনের সুন্নতের অনুসরণের মতো, যিনি ক্বোরআনে তাঁর প্রিয় হাবিবকে কখনো ত্বাহা, কখনো ইয়াসীন, কখনো মুযযাম্মিল, কখনো মুদ্দাস্সির উপাধি দিয়ে সম্বোধন করে তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

তৎকালীন সময়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে বিভিন্ন উপাধি দ্বারা স্মরণ করা এ জন্যও জরুরী ছিল যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নাম নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, কারণ তাঁর ও তাঁর প্রিয়জনদের জীবন হুমকির সম্মুখীন ছিল। যা হযরতের জন্মের পূর্বে হযরতের পিতামহের জন্মের সময় 'লওহে ফাতেমা'-তে মহান রব্বুল আলামীন তাঁর পুরো নাম মোহাম্মাদ না লিখে (মীম, হা, মীম দাল,) লিখে দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন।

পাঠকবৃন্দ! প্রবন্ধটি পড়ার পূর্বে আমরা নিজেরা আত্ম-পর্যালোচনা করে দেখি যে, তাঁর উপাধি আমরা কে কতখানি জানি। যাতে প্রবন্ধটির উপযোগিতা আমাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে। আল্লাহ আমাদের আলেম ও নেক্কার আলেমদের ছায়া চিরকাল আমাদের মাথার উপরে স্থায়ী রাখুন আর যাঁরা এই নশ্বর দুনিয়ার যাত্রা শেষ করে চিরন্তন দুনিয়ার দিকে হিজরত করেছেন আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। যাঁরা আমাদেরকে

হযরত ইমামে জামানা (আঃ)-এর সম্পর্কে ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এটা অতি স্পষ্ট বিষয় যে, অধিক নাম অধিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। আর এর বিপরীত অর্থাৎ অধিক বৈশিষ্ট্য অধিক নামের কারণ। যেহেতু মহানবী (সঃ) শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী তাই তাঁর মধ্যে সকল নবীদের যাবতীয় গুণাবলী বিদ্যমান। আর ইমামে জামান (আঃ) এই শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি তাই এনার মধ্যে নবীপাকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক, যার সবগুলো আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ মানুষরা সীমায়িত করতে পারি না।

উলেমায়ে কেরামগণ আসমানী গ্রন্থ, ক্বোরআনের আয়াত, মাসূম ইমামগণের হাদীস এবং যিয়ারতের বাক্যাংশ থেকে এই নাম ও উপাধিগুলি চয়ন করেছেন, যার সংখ্যা পাঁচ শতরও অধিক। 'ফৌজে আকবর' গ্রন্থের লেখক আয়াতুল্লাহ মোহাম্মাদ বাক্বের ফক্বীহ ঈমানী (রহঃ) একটি কবিতায় ইমাম (আঃ)-এর তিনশত তেরো (৩১৩) নাম ও উপাধি উল্লেখ করেছেন। মোহাদ্দিস নূরী (রহঃ) 'নাজমুস সাক্বিব' গ্রন্থে আরবী বর্ণের ক্রমানুযায়ী রেফারেন্স অর্থসহ ১৮০টি নাম ও উপাধি উল্লেখ করেছেন। 'আস সেরাতুস সাওয়ী ফী আহওয়ালিল মাহদী' গ্রন্থের লেখক মাননীয় মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মাদ সিবতাইন সির্সিভী আলাল্লাহু মাক্বামাহ্, উর্দু ভাষার এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ৪৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, একশত বিরাশি (১৮২) নাম ও উপাধি নাজমুস সাক্বিব গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আমরা নীচে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছি:

১. ইমাম (আঃ)-এর একটি নাম আহমদ

কামালুদ্দীন গ্রন্থে জনাব শায়খ সাদুক্ব (রহঃ) হযরত আমীরুল মো'মেনীন আলী (আঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আঃ) বলেছেন: শেষ জামানায় আমার এক পুত্র আবির্ভূত হবে, তার দুটি নাম থাকবে, একটি গোপন এবং একটি দৃশ্যমান, গোপন নাম হবে 'আহমদ' এবং দৃশ্যমান নাম হবে 'মোহাম্মাদ'।[1]

২. ইমাম (আঃ)-এর অপর একটি নাম হলো 'আসল'

শেখ কশি তাঁর 'রিজাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, আবু জাফর বিন আহমদ বিন জাফর ক্বুম্মী আত্তার 'আসল' নাম দিয়ে ইমামে জামানা (আঃ)-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন যার মধ্যে তিনি আবু হামিদ বিন ইব্রাহীম মারাগীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছিলেন, ইমাম তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। সুতরাং রিজালের কিতাবসমূহে উল্লিখিত 'আসল' নামটি ইমামে জামানা (আঃ)-কে নির্দেশ করে। কেননা হযরতই সকল জ্ঞান, বরকত ও সমৃদ্ধির মূল। আর দ্বীন ও দুনিয়ায়, বরযাখ ও আখেরাতে আল্লাহর বান্দাদের মারজা, মাওয়ি, হাদী ও মুলজা, অর্থাৎ বান্দাদের প্রত্যাবর্তনের স্থল, হেদায়েতকারী, আশার স্তম্ভ...।[2]

৩. 'ইযাদ শেনাস ও ইযাদ নির্দেশক'

এটিও হযরত (সঃ)-এর একটি নাম। শেখ বাহাই তাঁর 'কাস্কোল' গ্রন্থে লিখেছেন যে, পারস্যবাসী হযরতকে এই দুটি নামে স্মরণ করে। অর্থাৎ সেই 'আগমনকারী মাহদী' যার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, যিনি ঐশ্বরিক জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান রাখেন এবং মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেন।[3]

৪. 'আবু সালেহ'

'জাখিরাতুল আলবাব' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপাধি হলো 'আবুল কাসিম' এবং 'আবু সালেহ'

---

[1] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৩-৪৪৪।*

[2] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫।*

[3] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৫।*

আর হযরতের এই উপাধিদ্বয় মরুবাসী আরব ও বেদুইনদের মধ্যে খুবই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আর প্রায়শই এই লোকেরা তাদের সাহায্য প্রার্থনা ও অসীলায় হযরতকে এই নামে ডাকে। আর কবি-সাহিত্যিকরা প্রশংসামূলক কবিতা এটি উল্লেখ করেন। আর আগের যুগে হযরতের এই নামটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। যার অর্থ হলো সকল সত্যের উৎপত্তি স্থল।[1]

মাসূমীন (আঃ) জোর দিয়ে বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তির নাম 'মোহাম্মাদ' হলে সে যেন তার পুত্রের নাম ক্বাসিম না রাখে, যাতে শয়তান তাকে মাহদাবিয়াতের দাবী করার জন্য বিভ্রান্ত না করে ফেলে, আর লোকেরা তাকে মোহাম্মাদ আবুল ক্বাসিম নামে ডাকতে থাকে। ইমামে জামানা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনাবলী সম্বলিত গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি মিশরের একটি সেতুর উপর ঘি বিক্রি করত (যাঁর পিতা সুন্নি সম্প্রদায়ের হলেও তার মা ছিলেন শিয়া) সুতরাং তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে ঘি জড় করতেন। একবার ঘি সংগ্রহ করে ফেরার সময় ক্লান্তির কারণে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তাঁর সঙ্গীরা তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে গেলো এবং যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো দেখলো যে, অতি সত্তরই সূর্য ডুবে যাবে এবং অন্ধকার ছেয়ে যাবে। আর ফেরার পথও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তাঁর কাছে কোনো অস্ত্রও ছিল না। তখন তাঁর মায়ের উপদেশ তাঁর মনে পড়লো, তাঁর মা বলে দিয়েছেন যে, যখনই কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে তখন 'يا ابا صالح المهدى ادركنى-ইয়া আবা সালেহ্ আল-মাহদী-আমাকে সাহায্য করো' বলে: ডাক দেবে। তিনি বলেন যে, আমি এই বলে ডাকার সাথে সাথে একটি ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক আমার কাছে এসে তার ঘোড়ায় আমাকে বসিয়ে নিলেন। আর কিছুক্ষণ পরে আমাকে ইশারায় বললেন যে, তোমার বিপদ টলে গিয়েছে অল্প দূরের ঐ গ্রাম থেকে তোমার বাড়ি ফেরার পথ পেয়ে যাবে। আমি তাঁকে অনেক তোষামোদ করলাম যে, আপনিও আমার সাথে চলুন তিনি বললেন না, তুমি যাও আমাকে আমার অন্য প্রিয়জনদের সাহায্য করতে যেতে হবে। তিনি যখন এ কথা বলে চলে গেলেন, তখন বুঝলাম, হায়!!! আমি কি করলাম? পেয়েও আমি আমার হিতৈষীকে হারিয়ে ফেললাম।

৫. 'আমীরুল ওমারা'

অত্যন্ত মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি 'ফজল বিন শাজান' 'গায়বত' গ্রন্থে হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমীরুল মো'মেনীন আলী (আঃ) ফিতনা, যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন, দাজ্জাল আসবে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভ্রষ্টাতায় নিমজ্জিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ওহে হোসায়েন! তোমার নবম পুত্র, যিনি 'আমীরুল ওমারা' এবং 'কুফরের ঘাতক' এবং সুলতানে মামুল, যাঁর গায়বতে চিন্তা হতবুদ্ধি হবে, তিনি 'রুকন ও মাক্বাম'-এর মাঝে জনগণের মধ্যে আবির্ভুত হবেন, তিনি জ্বীন ও মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন এবং তিনি হবেন সকল রাজাদের রাজা।[2]

পাঠকগণ! গায়বতের যুগেও তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরে 'মোক্বাল্লিবাল ক্বুলূব' আর তাঁর প্রিয়জনদেরকে সকল দুষ্ট শাসক ও রাজা-বাদশাদের অনিষ্ট ও অত্যাচার থেকে সাহায্যকারী।

৬. বাক্বিয়াতুল্লাহ

বাক্বিয়াতুল্লাহ হযরতের একটি অতি বিখ্যাত উপাধি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র ক্বোরআনের সূরা হুদের ৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

---

[1] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৬।*

[2] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৭।*

(ক) ফজল ইবনে শাজান ‘গায়বত’ গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, তিনি (ইমাম মাহদী আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি কাবার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন এবং তাঁর চারপাশে তিনশ তেরোজন সাহাবী সমবেত হবেন। আর হযরত ইমামে জামানা (আঃ) সর্বপ্রথম সূরা হুদের এই আয়াতটি পাঠ করবেন: بَقِيَّةُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আল্লাহর অবশিষ্ট তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মো’মিন হও। তিনি বলবেন, আমি বাক্বিয়াতুল্লাহ্, আমি হুজ্জাতুল্লাহ্ (আল্লাহর প্রমাণ) এবং আমি খলীফাতুল্লাহ্ (পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা)। অতএব ‘اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِيْ أَرْضِهِ’- আস্সালামো আলাইকা ইয়া বাক্বিয়াতুল্লাহ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর অবশিষ্টাংশ।’ এই শব্দ ছাড়া কেউ হযরতকে সালাম করবে না।[1]

(খ) এই আয়াত সম্পর্কে অন্যান্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, হযরত যখন এ ঘোষণা দেবেন তখন পৃথিবীর সকল মানুষ নিজ নিজ ভাষায় তা শুনবে এবং লাব্বাইক বলে হযরতের হাতে বাইয়াত ও আনুগত্য করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সুতরাং হযরতের এই উপাধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় দোয়া ও যিয়ারতে এই উপাধি দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

(গ) তাফসীরে ফুরাতে শেখ ফুরাত বিন ইব্রাহীম এই আয়াতের অধীনে উমর ইবনে যাহির হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, আমি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ইয়া আমীরাল মোমেনীন! বলে অভিবাদন জানাই বা সালাম করি। তিনি বললেন: না, কখনও নয়। তাঁকে আমীরুল মোমেনীন বলে সম্বোধন করবে না। কারণ এই উপাধিটি এমন একটি উপাধি যেটিকে মহান রব্বুল আলামীন কেবলমাত্র হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর পূর্বে না এই উপাধি কাউকে দেওয়া হয়েছে, আর না তাঁর পরবর্তীতে কাউকে দেওয়া হবে। কেবল বে-দ্বীনরাই এর অপ-ব্যবহার করবে। তখন রাবী জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাহলে আমরা কীভাবে তাঁকে সালাম জানাবো? তখন ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বললেন:اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ – আস্সালামো আলাইকা ইয়া বাক্বিয়াতাল্লাহ্ বলে সালাম জানাবে। অতঃপর তিনি ক্বোরআনের উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।[2]

৭. বাক্বিয়াতুল আম্বিয়া

এই নামটি আরও কিছু উপাধির সাথে সাইয়েদ হুসাইন মুফতি কারকী সিবতে মোহাক্কিক্বে ছানী জনাব হাকিমা (সাঃ) হতে ‘দাফউল মানাদাত’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম (আঃ)-এর জন্মের পরেই তাঁকে হুজ্জাতুল্লাহ, বাক্বিয়াতুল আম্বিয়া, ‘নূরুল আসফিয়া', ‘গওছুল ফোক্বারা, ‘খাতিমুল আসফিয়া’, ‘নূরুল আৎক্বিয়া’ এবং সাহেবে ‘কুর্রাতুল বাইযা’ উপাধিসমূহ দ্বারা কথা সম্বোধন করার জন্য বলা হয়েছিল। আর জন্মের সময় তিনি اشهد ان لا اله اِلَّا الله আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং অন্যান্য আয়াত পাঠ করে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্যদান করেছিলেন।[3]

হাফিজ বর্সী মাশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরতকে এভাবে সম্বোধন করতে হবে: হুজ্জাতুল্লাহ, বাক্বিয়াতুল্লাহ্, বাক্বিয়াতুল আম্বিয়া, খাতিমুল আউসিয়া, সাহেবু কুর্রাতুল বাইযা, মিসবাহু মিনাল বাহরিল আমীক্ব, আশ-শাদীদুয যিয়া, খলীফাতুল আৎক্বিয়া ও নূরুল আউসিয়া। এ সকল পবিত্র নাম ও উপাধি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

[1] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৭।

[2] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৭।

[3] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৪৯।

আর এই নামকরণের কারণ স্বয়ং উপাধি দ্বারাই স্পষ্ট।[1]

৮. ছায়ির

ছায়ির সেই প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে বলা হয় যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করা অবধি বিশ্রাম নেন না। আর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) শুধু তাঁর পূর্বপুরুষদের নয়, সমস্ত আম্বিয়া ও আউসিয়াদের রক্তের প্রতিশোধ নেবেন। সুতরাং দোয়ায়ে নুদবাহতে বলা হয়েছে: أَيْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلا. يَا لَثَارَاتِ الْحُسَيْنِ–কোথায় সেই আম্বিয়া ও আম্বিয়াগণের সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী? কোথায় কারবলার শহীদগণের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী? আর অন্য এক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, আবির্ভাবের সময় হযরতের স্লোগাণ হবে ইয়া লাছারাতিল হোসায়েন অর্থাৎ ওহে হোসায়নের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী!

৯. জাফর

'কামালুদ্দীন' ও 'গায়বাত শায়খ তুসী' (রহঃ) গ্রন্থে হযরতের এই উপাধি রাখার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরতের প্রেমিকরা এটি ব্যবহার করবে এবং তাঁর চাচার অনুসারীরা তাঁকে বুঝবে, আর এভাবে হযরতের প্রেমিকগণ অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে।[2]

হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) এই উপাধির কারণও ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত (আঃ) হলেন ঐশী জ্ঞানের সমুদ্র, আর হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে জ্ঞানের দুটি অংশই মাত্র সাধারণতন্ত্রলাভ করবে আর তিনি এসে অবশিষ্ট সকল অংশ সর্বসাধারণের জন্য পরিব্যাপ্ত করবেন। এই জন্য তাঁর অপর উপাধি জাফর, আর জাফরের অর্থ হলো জলধারা।[3]

১০. দাঈ অর্থাৎ আহ্বানকারী

হযরতের এই উপাধি যিয়ারতে আলে ইয়াসীনে বর্ণিত হয়েছে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ - আস-সালামো আলাইকা ইয়া দাঈআল্লাহ্ অর্থাৎ সালাম আপনার প্রতি ওহে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী! কেননা তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হবেন। আর তিনি সকল মুখলুক্বকে আল্লাহর দিকে এভাবে আহ্বান করবেন যে, তাঁর প্রপিতামহ হযরত নবী করীম (সঃ)এর দ্বীন ছাড়া পৃথিবীতে আর অন্য কোন দ্বীন থাকবে না। তাফসির আলী ইবনে ইব্রাহীম ক্বুম্মীতে, ... يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُا نُوْرَ اللهِ-তারা চায় আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে...,[4] এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান রব্বুল আলামীন তাঁর নূরকে ক্বায়েমে আলে মোহাম্মাদ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রাখবেন।[5]

১১. সাআতুন অর্থাৎ ত্বরান্বিত হওয়া

হযরতের এই উপাধিটি পুনরুত্থান দিবসের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ হযরতের আবির্ভাব ও ক্বেয়ামত উভয়ই হঠাৎ ঘটতে চলেছে। হযরত ইমাম হাসানে মুজতবা (আঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: তা অকস্মাৎ ঘটবে। সাআত অর্থাৎ সেই মুহূর্ত বা সময় যা হঠাৎ ঘটবে।[6]

১২. শারীদ

'শারীদ' অর্থাৎ যাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই উপাধিটি মাসূম ইমামগণ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) এবং হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) প্রায়শই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ মুখলূক্ব হযরত ইমামে জামানা (আঃ)-এর কদর করেনি এবং তাঁর মারেফাত অর্জন

---

[1] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫০।
[2] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫১।
[3] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫১।
[4] সূরা: সাফ্ফ্ আঃ ৪।
[5] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫৭।
[6] আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫৮।

করেনি। হযরত ইমামে জামানা (আঃ) স্বয়ং ইব্রাহীম ইবনে আলী ইবনে মাহযিয়ারকে বলেছেন: আমার সম্মানীয় পিতা আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, আমি যেন পৃথিবীতে এমন এক জায়গায় থাকি যা অতি গোপনীয় স্থান, যাতে আমার অবস্থা কারও কাছে প্রকাশ না পায়। কেননা পথভ্রষ্টরা আমার অনিষ্টের জন্য সদা সচেষ্ট।[1]

১৩. খালফ এবং খালফে সালেহ্

এই উপাধিটি মাসূম ইমামগণ (আঃ) বারবার ব্যবহার করতেন।

(ক) হযরত ইমাম আলী রেজা (আঃ) বলেছেন: খালফে সালেহ্ আবি মোহাম্মাদ হাসান বিন আলীর পুত্র এবং তিনি (বৃহত্তর) যুগের কর্তা এবং তিনিই মাহদী।

(খ) হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেছেন: খালফ সালেহ্ আমার সন্তানদের মধ্য থেকে..., আর খালফ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী তিনি সকল আম্বিয়া ও আউসিয়াগণের উত্তরসূরি। আর তিনি আম্বিয়া ও আউসিয়াদের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর ঐশ্বরিক ওয়ারিশ অর্থাৎ যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে আল্লাহর এক প্রিতিনিধি অন্য প্রতিনিধির নিকট থেকে সবকিছু গ্রহণ করেন। আর নবীপাক (সঃ)-এর সকল তাবার্রুকাত (নবীর ব্যবহারকৃত বস্তু-সামগ্রী) এনার কাছে রয়েছে। আর সেই সাথে সাথে তিনি সকল আম্বিয়ারও খলীফা বা প্রতিনিধি।

(গ) হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর কোনো সন্তান না থাকার কারণে লোকে বলতো: এবার প্রতিনিধিত্বের এই পরম্পরা শেষ হয়ে যাবে। তবে এক দল মানুষ এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে ছিল যে, প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা অব্যহত থাকবে। আর তখন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্ম হলো এবং শিয়া সম্প্রদায় একে অপরকে সুসংবাদ দিতে ও অভিনন্দন জানাতে লাগলো যে, একজন খলীফা ও উত্তরসূরি আবির্ভূত হয়েছেন। আর তাকে নির্দেশ করার জন্য মাসূম ইমামগণই তাঁকে এই খালফে সালেহ্ উপাধি দিয়ে স্মরণ করেছেন।[2]

১৪. গ্বারীম

গ্বারীম মানে অনুসন্ধানকারী। ইলমে রেজাল বিশারদগণ স্পষ্ট করেছেন যে, এটি হযরতের বিশেষ উপাধিগুলির একটি। হযরতের এই উপাধিটি তাক্বাইয়ার কারণে ছিল যে, হযরতের নায়েবগণ যখন হযরতের কাছে টাকা পাঠাতে চাইতেন, তখন তাঁরা তাঁকে এই উপাধি দ্বারা সম্বোধিত করতেন। শেখ মুফীদ (রহঃ) এরশাদ বিন মোহাম্মাদ বিন সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমার পিতা ইন্তেকাল করেন এবং ব্যবসার যাবতীয় দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়, তখন আমি আমার মরহুম পিতার হাতের লেখা একটি চিঠি পাই যার মধ্যে ঐসব লোকেদের নাম ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ ছিল যাদের কাছে গ্বারীমের সম্পদ গচ্ছিত ছিল।[3]

পাঠকবর্গ! নিবন্ধের দৈর্ঘ্য এবং শিরোনামের পরিধির কারণে আমরা অনুশোচিত, কারণ পুরো উল্লেখ করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়, আবার ক্ষ্যান্ত দিলে জানার তৃষ্ঞা মেটে না!!! তবে মনে করি যে, এই শিরোনামে উৎকর্ষতা আরও তথ্য পেতে পাঠকবর্গকে নিশ্চয় আরও আগ্রহী করে তুলেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, নীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতরা এ বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, হযরতের সান্নিধ্য পেতে হলে প্রতিদিন হযরতের যিয়ারতগুলোর মধ্যে থেকে অন্ততঃ একটি যিয়ারত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে হযরতের খেদমতে সালাম পেশ করুন। মুস্তাহাব আমলগুলো হযরতের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দিন।

পরবর্তী অংশ ২৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

[1] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫৭।*

[2] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫।*

[3] *আস-সেরাতুস সাওয়ী, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩।*

AL QAEM AL MUNTAZAR, JAN 2022 to JUNE 2022, VOL XXIV, ISSUE NO. I, RNI No. 70209/98

হযরত আলী (আঃ) মসজিদে কুফার মেম্বরে দাঁড়িয়ে নিজ খোৎবায় (প্রার্থনারত হয়ে) বলেছেন: হে আল্লাহ! এটা আবশ্যক যে, তোমার জমীন তোমার হুজ্জত-শূন্য যেন না থাকে, যে (হুজ্জাত-প্রতিনিধি) মানুষদেরকে তোমার দ্বীনের দিকে আহ্বান করবেন এবং তোমার দ্বীনের তালিম দেবেন, যাতে তোমার হুজ্জাতকে (কেউ) বাতিল না ভাবে এবং তোমার আউলিয়া (প্রিয়জন)-দের আনুগত্যকারীরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার পরে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত না হয়। তোমার এই হুজ্জাত প্রকাশ্যে থাকুন বা প্রচ্ছন্নে, তাঁর আনুগত্য করা হোক বা না হোক, আর দুশমন তাঁর উপর অতর্কিতে আক্রমণের লক্ষ্যে ওঁত পেতে বসেই বা থাকুক। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে পরিচিত হোক বা নাই হোক, তথাপিও তাঁর মারেফাত, তাঁর আদব ও আখলাক মোমিনরা অন্তরে ধারণ করে রয়েছে এবং তার উপরে তারা আমলরতও রয়েছে।

(কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নে'মাহ্, খঃ ১, বাব: ২৬, হাঃ ১১)

www.almuntazar.in

خط و کتابت کا پتہ : ایسوسی ایشن آف امام مہدی، پوسٹ بکس نمبر ۱۹۸۲۲، ممبئی ۴۰۰۰۵۰